সম্পাদকীয়

তাহরীকে জাদীদ

নব বিশ্বব্যবস্থার পূর্বাভাস দানকারী ক্ষুদ্রকায় এক নমুনা চিত্র

১৯৪২ ঈসাব্দে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ২য় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) ঐশী সমর্থনপুষ্ট এ জামা'তের বিস্তৃতি লাভের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, আজ তা আক্ষরিক অর্থেই পূর্ণতা পেয়েছে। তাহরীকে জাদীদের মহান ঐ পরিকল্পনাধীনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আজ প্রায় দু'শত দেশে মজবুত কাণ্ডের ওপর দাঁড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্! আগামী নভেম্বর মাসের ১ম জুমুআ'য় হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তাহরীকে জাদীদের নববর্ষ ঘোষণাকালে এই মহান কর্মকাণ্ডের আরও বিস্তারিত বিবরণ দান করবেন ইনশাআল্লাহ্। 'তাহরীকে জাদীদ'-এর মহান পরিকল্পনা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক **'নেযামে নও'**-এ বলেন–

'তাহরীকে জাদীদ'–টা কী! এটা হলো খোদা তাআলার সমীপে ঈমানের এক উপহার উপস্থাপন করা, ওসীয়্যত ব্যবস্থার মাধ্যমে তুমি সমগ্র বিশ্বে মহান যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছো, তা আসতে বিলম্বিত হচ্ছে, এজন্য আমরা যদ্দিন ওসীয়্যত ব্যবস্থা সুদৃঢ় না হয় তোমার সমীপে মহান ওই ব্যবস্থাপনার ছোট এক নমুনা চিত্র তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে উপস্থাপন করছি, আর এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় যে তহবিল গড়ে ওঠবে, তা দিয়ে আহমদীয়াতের প্রচার বৃদ্ধি করা হবে। সেই তবলীগের ফলে ওসীয়্যতের বিস্তার লাভ হবে।

তাহরীকে জাদীদ নব বিশ্বব্যবস্থার অগ্রদূত স্বরূপঃ

তাহরীকে জাদীদ যদিও ওসীয়্যতের পর চালু হয়েছে তবুও কুরবানী অনুশীলনের মানদণ্ডে এটা ওসীয়্যতের পূর্বসূরী। ইলিয়াস নবীর ভূমিকা মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ.) এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যেমন, তেমনি তাহরীকে জাদীদের কর্মসূচী ওসীয়্যতের নব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত স্বরূপ। তার আগমণ যেভাবে ঈসা (আ.) এর আবির্ভাব ও বিজয়ের শুভ সংবাদ আগাম বয়ে এনেছিল, তেমনি প্রতিটি ব্যক্তি যারা তাহরীকে জাদীদের কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করে তারা ওসীয়্যত ব্যবস্থা কার্যকর করায় বিশেষ ভূমিকা রাখে আর যারা এভাবে ওসীয়্যতের বিস্তার ঘটায় তারা নব বিশ্ব বিনির্মাণে সবিশেষ অবদান রাখে।

সারসংক্ষেপ এ ভাবে টানা যায় যেমনটা আমি বলেছি, 'ওসীয়্যত ব্যবস্থা' ইসলাম প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় নির্দেশাবলীর ধারক। কোন কোন ব্যক্তি ভুলক্রমে মনে করে ওসীয়্যতে আহরিত অর্থ সম্পদ শুধুমাত্র প্রচার কার্যক্রমকে তুলে ধরতে ব্যয়িত হবে। ভুল কথা! এটা যথাসিদ্ধ নয়। ওসীয়্যতের অর্থ আহমদীয়াতের প্রচার এবং সেই প্রচারের কার্যকর রূপদান–উভয়েরই জন্য। প্রচার কার্যক্রম যেমন এর অন্তর্ভূক্ত তেমনি সেই নব ব্যবস্থার পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়নও এতে নিহিত, যার আওতায় সম্মান জনকভাবে প্রত্যেকের জীবনোপকরণ জোগানো হবে।

ওসীয়্যতের ব্যবস্থা যখন পূর্ণাঙ্গীন রূপ পাবে তখন তদ্বারা কেবল প্রচারই হবে না বরং ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের চাহিদাকে এ দ্বারা মিটিয়ে দেয়া হবে আর সমগ্র বিশ্ব থেকে দু:খ দুর্দশা বিদূরীত করে দেয়া হবে। ইনশাআল্লাহ্! বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে, পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ভালবাসা আর মমতাপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নিয়ে একে অপরকে সাহায্য করবে। তার এ 'দান' প্রতিদান বিহীন থাকবে না বরং প্রত্যেক দাতা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পাবে। ধনীরা ক্ষতির মুখে পড়বে না, ঠকবে না দরিদ্ররাও। দেশে দেশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাঁধবে না বরং তাদের পরোপকারের ছায়া গোটা বিশ্বকেই ছেয়ে নেবে।

অতএব, হে বন্ধুগণ! মি. চার্চিল বিশ্বে নব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন না, পারবেন না রুজভেল্ট সাহেবও। 'আটলান্টিক চার্টার'-এর ঘোষণাও নিরর্থক, এর রয়েছে নানাবিধ ত্রুটি আর বহুমুখী অপূর্ণতা। নব ব্যবস্থার প্রবর্তন তারাই সাধন করতে পারেন যারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হোন।

তাদের মনে বিত্তবানদের প্রতি আক্রোশ থাকে না আর গরীবদের প্রতিও থাকে না কোন অন্ধ মায়া, তারা প্রাচ্যেরও নন, নন প্রতীচ্যেরও। তারা হলেন খোদা তাআলার বার্তাবাহক-নবী। আর জগৎসমক্ষে তারা সেই শিক্ষাই উপস্থাপন করেন, যা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সত্য ও সঠিক পথ নির্দেশ করে। অতএব, বর্তমানেও সেই শিক্ষাই শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবে যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে বিশ্ব প্রাপ্ত হয়েছে আর ১৯০৫ ঈসাব্দে তিনি এরই ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন।

৩১ অক্টোবর ২০০৯

সূচীপত্র — *পৃষ্ঠা নং*

- **কুরআন শরীফ** — ২
- **হাদীস শরীফ** — ৩
- **অমৃত বাণী** — ৪
- ***জুমুআর খুতবা ঃ*** — ৫-১২
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- **ঈদুল আযহিয়ার খুতবা** — ১৩-১৯
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- **পবিত্র কুরআন শিক্ষার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ হুযূর (আই.)-এর ঈমান উদ্দীপক বাণী** — ২০-২১
- **ইসলাম প্রচার-প্রসার ও বিস্তারে আহমদীয়াত** — ২২-২৪
- **মহত্তম জীবনের স্বরূপ** — ২৫-৩০
  মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
- **সংবাদ** — ৩১-৩৩
- **কৃষিপাতা (শীতকালীন টমেটো চাষ)** — ৩৪-৩৫
- **দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে** — ৩৬
  সংকলন ও উপস্থাপনা ঃ এম, আহমদ

প্রচ্ছদ : **তারেক আহমদ সবুজ**

কুরআন শরীফ

সূরা হুদ-১১

৬৭। অতএব আমাদের আদেশ যখন এসে গেলো তখন আমরা সালেহ্‌কে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমরা আমাদের বিশেষ কৃপায় উদ্ধার করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকেও (রক্ষা করলাম)। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই অতি শক্তিশালী (ও) মহাপরাক্রমশালী।

فَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا نَجَّیۡنَا صٰلِحًا وَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ بِرَحۡمَۃٍ مِّنَّا وَ مِنۡ خِزۡیِ یَوۡمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ الۡقَوِیُّ الۡعَزِیۡزُ ﴿۶۷﴾

৬৮। আর যারা যুলুম করেছিল এক বিকট শব্দকারী আযাব[১৩২৮] তাদের আঘাত হানলো। আর তারা প্রত্যুষে তাদের বাড়িঘরে মুখ থুব্‌ড়ে এমনভাবে পড়ে রইল,

وَ اَخَذَ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوا الصَّیۡحَۃُ فَاَصۡبَحُوۡا فِیۡ دِیَارِهِمۡ جٰثِمِیۡنَ ﴿۶۸﴾

৬৯। যেন তারা এতে কখনও বসবাস করে নি। শুন! নিশ্চয় সামুদ (জাতি) তাদের প্রভু-প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। সাবধান! সামুদ (জাতির)[১৩২৯] জন্য ধ্বংস।

کَاَنۡ لَّمۡ یَغۡنَوۡا فِیۡهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوۡدَا۠ کَفَرُوۡا رَبَّهُمۡ ؕ اَلَا بُعۡدًا لِّثَمُوۡدَ ﴿۶۹﴾

১৩২৮। সামুদ জাতির ওপরে পতিত শাস্তি প্রকাশের জন্য সাত প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এবং শব্দমালা কুরআন করীমে ব্যবহৃত হয়েছে: তফসীরাধীন ও ৫৪:৩২ আয়াতে **"সায়হাহ"** (শাস্তি); ৭:৭৯ আয়াতে **রায্‌ফাহ্‌** (ভূমিকম্প); ২৬:১৫৯ এর মধ্যে শুধু **আযাব** (শাস্তি); ২৭:৫২তে, **'দামমারনা'-হুম** (তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করলাম:) ৫১:৪৫এর মধ্যে **'সায়কাহ্‌'** (বজ্রপাত অথবা অন্য কোন ধ্বংসাত্মক শাস্তি); ৬৯:৬ তে **তাগিয়াহ্‌** (অসাধারণ শাস্তি); এবং **৯১:১৫** আয়াতের মধ্যে **ফাদামদামা আলাই হিম্‌** (তিনি তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিলেন)। যদিও আল্লাহ্‌ তাআলার আযাব বুঝাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার হয়েছে **রাজ্‌ফাহ, সায়হাহ, সায়কাহ** এবং **তাগিয়াহ্‌** শব্দগুলি মনে হয় পরস্পর বিপরীত অর্থবোধক। যেহেতু শেষোক্ত শব্দত্রয় শাস্তি অর্থে প্রযোজ্য হয়, তাই অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য নাই। মোটকথা সামুদ জাতি ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছিল। উপরোক্ত শব্দগুলিও একই অর্থে আকস্মিক মহা দুর্ঘটনাকেই বুঝায়।

১৩২৯। পূর্ববর্তী ৬১ নং আয়াতে হূদের জাতি শব্দগুলি 'আদ' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে। কারণ 'আদ' প্রকৃতপক্ষে দু'টি গোত্রের নাম, **আদে উলা** বা প্রথম 'আদ' এবং **'আদে সানীয়া'** বা দ্বিতীয় 'আদ'; এবং হূদের জাতি শব্দগুলি যুক্ত হওয়ায় এটাই বুঝায় যে, তারা প্রথম গোত্র, দ্বিতীয় 'আদ' নহে। কিন্তু এখানে যেহেতু 'সামুদ' একটি মাত্র উপজাতির নাম, সেই জন্য 'সালেহ (আ.)-এর জাতি' এই কথাগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ এই শব্দগুলি যোগ হলেও বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সফল হতো না।

হাদীস শরীফ
নবজীবন দানকারী–হযরত রাসূল করীম (সা.)

কুরআন :

“হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন সে তোমাদেরকে জীবিত করার জন্য ডাকে।

(সূরা আনফাল, আয়াত নং ২৫)

হাদীস :

হযরত যাবের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন, আমার ও তোমাদের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন জ্বালিয়েছে আর এর ফলে কীট-পতঙ্গ (সেই আগুনে) পড়তে লাগলো, সেই ব্যক্তিটি কীট-পতঙ্গগুলিকে সেই আগুন থেকে দূরে সরাতে লাগল যাতে করে তারা জ্বলে-পুড়ে মারা না যায়। অনুরূপভাবে দোযখ হতে বাঁচানোর জন্যে আমি তোমাদেরকে পিছন থেকে ধরে টানছি আর তোমরা আমার হাত থেকে বের হয়ে চলে যাও। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা :

ওপরে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মানবজাতিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর **কুওওয়াতে কুদসিয়া** (পবিত্রকরণ শক্তি) সম্বন্ধে বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন তোমাদেরকে আহ্বান করেন জেনে রেখো, তাঁর ডাকে সাড়া দানকারী নবজীবন লাভ করবে। কারণ তিনি তোমাদেরকে আমার পথে চলার পদ্ধতি তোমাদের জানায়। তাঁর আহ্বান বস্তুত: আমারই আহ্বান। হযরত রাসূল করীম (সা.) আমাদেরকে আমাদের স্বভাবজাত অবাধ্যতাকে নির্মূল করে খোদার আনুগত্যের পথে পরিচালিত করতে চান। আর এই পথ-প্রদর্শনায় তিনিই একমাত্র কামেল পুরুষ। কারণ আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করেছেন। এ জন্যে তিনি (সা.) হচ্ছেন একমাত্র পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষক। হাদীস হতে জানা যায় যে, হুযূর (সা.) আমাদের কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল! কিন্তু আমরাই হতভাগ্য যে, তাঁর হাত হতে ছুটে পড়ি এবং নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনি। আমাদের মুক্তি তাঁর সাথেই সম্পৃক্ত। তাঁর আনুগত্য ব্যতিরেকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, “আরবের অরণ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। লক্ষ লক্ষ মৃত ব্যক্তি অল্প কিছুদিনের মধ্যে জীবিত হয়ে গেলো। অতীতের বিকৃত মানুষগুলি খোদার রঙে রঙীন হয়ে গেল। অন্ধরা চক্ষুষ্মান হলো। মুকদের কণ্ঠে খোদার তত্ত্বজ্ঞান জারী হলো। পৃথিবীতে একবারই এরূপ ঘটেছে। এর পূর্বে এরূপ না কেউ দেখেছে আর না কেউ শুনেছে। তোমরা কি জান এটা কি ছিল? এটা একজন **ফানাফিল্লাহ্’র** অন্ধকার গভীর রাতের দোয়া-ই তো ছিল। (রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১০)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, “মানবজাতির জন্যে জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই, এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) ভিন্ন কোনই রসূল এবং যোজক নেই। অতএব, তোমরা সেই মহা গৌরবমন্ডিত নবীর সাথে প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাউকেও তাঁর ওপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান কর না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলে পরিগণিত হতে পার।”

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ:-২৫)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত অনুসারী হয়ে তাঁর হাতে হাত রেখে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা :

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে আমার বন্ধুরা! আমার প্রিয়রা! আমার বৃক্ষরূপ অস্তিত্বের সবুজ শাখারা! তোমাদের ওপর বর্ষিত খোদা তাআলার অনুগ্রহে তোমরা আমার বয়আত করেছ এবং নিজেদের জীবন, নিজেদের আরাম ও নিজেদের ধন-সম্পদ এ পথে বিলিয়ে দিচ্ছ। যদিও আমি জানি আমি যা-ই বলবো তা স্বীকার করে নেয়াকে তোমরা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করবে এবং তোমাদের শক্তি অনুযায়ী তা করতে কুণ্ঠিত হবে না, তথাপি এ খেদমতের জন্য আমি নিজ মুখে নির্দিষ্ট কোন কিছু তোমাদের ওপর ধার্য করতে পারবো না, যেন তোমাদের খেদমত আমার বলার দরুন বাধ্যতামূলক না হয়ে তোমাদের নিজেদের খুশীতেই হয়। আমার বন্ধু কে? আর আমার প্রিয়ই বা কে? সে-ই, যে আমাকে চিনে। আমাকে কে চিনে? কেবল সে-ই, যে আমার সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, আমি (খোদাকর্তৃক) প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে সেভাবেই গ্রহণ কর যেভাবে প্রেরিত পুরুষগণকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করতে পারে না, কেননা আমি দুনিয়া থেকে নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে সেই (আধ্যাত্মিক) জগতের অংশ দেয়া হয়েছে, তারা আমাকে গ্রহণ করেন এবং করবেন। আমাকে যে বর্জন করে সে তাঁকে বর্জন করে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, যাঁর পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমার হাতে এক প্রদীপ আছে। যে আমার নিকট আসে সে অবশ্যই এ আলো থেকে অংশ পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণার দরুন দূরে সরে পড়ে, তাকে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলা হবে।

এ যুগের দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই, যে পাপ বর্জন করে ও পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদা তাআলার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়। যে-ই এরূপ করবে সে আমার এবং আমি তার। কিন্তু এরূপ করতে কেবল সে-ই সক্ষম হয়, যাকে খোদা তাআলা পবিত্রতা সাধনকারী ব্যক্তির ছায়া তলে আশ্রয় দেন। তখন খোদা তাআলা সেই ব্যক্তির নফসের দোযখের ভিতর নিজের পা রেখে দেন। তখন তা এরূপ ঠান্ডা হয়ে যায় যেন তাতে কখনো আগুন ছিল না। তখন সে উন্নতির পর উন্নতি করতে থাকে। এমন কি খোদা তাআলার রূহ তার মাঝে অবস্থান করে এবং এক বিশেষ জ্যোতির্বিকাশসহ হৃদয়ে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের অধিষ্ঠান হয়। তখন তার পুরাতন মনুষ্যত্ব জ্বলে ছাই হয়ে যায় এবং এক নতুন ও পবিত্র মনুষ্যত্ব তাকে দান করা হয়। খোদা তাআলাও এক নতুন খোদা হয়ে তার সাথে এক নতুন ও বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তার স্বর্গীয় জীবনের সকল পবিত্র উপকরণ এ জগতেই সে পেয়ে যায়।

(ফতেহ ইসলাম, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩)

এ যুগের দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই, যে পাপ বর্জন করে ও পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদা তাআলার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়। যে-ই এরূপ করবে সে আমার এবং আমি তার।

মানব জাতির জন্য পৃথিবীতে আজ কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নেই এবং সকল আদম সন্তানের জন্য আজ রসূল (সা.) ব্যতীত অন্য কোন শাফী (সুপারিশকারী) নেই

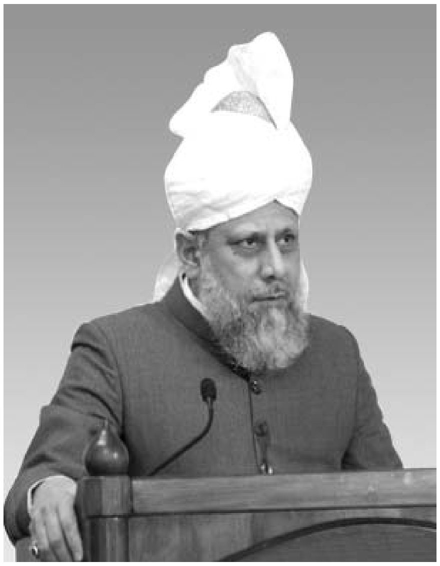

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৯-এর (৪ তাবুক, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমু'আর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (آمين)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۘ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٦﴾ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۗ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٧﴾

এ আয়াতের অনুবাদ হল, **'রমযান সেই মাস যাতে মানুষের জন্য এক মহান দিক নির্দেশক হিসেবে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ যার ভেতর হেদায়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আর সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যসূচক বিষয়াদি রয়েছে। অতএব, তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ এই মাস পায় তার রোযা রাখা উচিত, কিন্তু যে অসুস্থ্য অথবা সফরে থাকে তাকে বছরের অন্য সময়ে এই গণনা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সাচ্ছন্দ্য চান– কাঠিন্য নয়। তিনি চান, তোমরা যেন এই গণনাকে সাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হেদায়াত দান করেছেন এর জন্য তোমরা তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হও।'**

(সূরা আল্ বাকারা:১৮৬)

আজ আমি এ আয়াতের প্রথমাংশ সম্পর্কে কিছু বলবো। রমযান মাসের সাথে পবিত্র কুরআনের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেছেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

এর (আয়াতের) মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, রমযান মাসে রোযা রাখার বিষয়টি এমনিতেই নির্ধারণ করা হয়নি। বরং, এ মাসে মহানবী (সা.)-এর প্রতি পবিত্র কুরআনের মত মহান কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে বা অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করেছে। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, প্রতি বছর রমযানে হযরত জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাছে পবিত্র কুরআনের নাযিলকৃত অংশ সমূহের পুনরাবৃত্তি করতেন বা করাতেন। খোদা তাআলার সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত এ মাসে অবতীর্ণ হওয়া বা অবতীর্ণ হতে আরম্ভ হবার দৃষ্টিকোণ থেকে এ মাসটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়।

অতএব, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দিতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন, 'তোমাদের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করা হল' এরপর দোয়া কবুল হবার সুসংবাদ দিয়েছেন। এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে রমযান সম্পর্কিত আরো কতক নির্দেশাবলী প্রদান করেছেন এবং এটি স্পষ্ট করেছেন যে, কেবল রোযা রাখা এবং ইবাদত করাই যথেষ্ট নয়, বরং এ মাসে পবিত্র কুরআনের প্রতিও তোমাদের মনোযোগ থাকা চাই; কুরআন

পাঠের প্রতিও তোমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত। রোযার অসাধারণ গুরুত্বের কারণ হল, এ মাসে একজন পরিপূর্ণ মানবের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত নাযিল করেছেন, যা পবিত্র কুরআন আকারে অবতীর্ণ হয়েছে। খোদা তাআলার নৈকট্য লাভের রীতি ও দোয়া করার পদ্ধতি তোমরা এ কারণে শিখতে পেরেছ যে, খোদা তাআলা পবিত্র কুরআনে সেই রীতি-পদ্ধতি শিখিয়েছেন। এর মাধ্যমেই দোয়া গৃহীত হবার নিদর্শন প্রকাশিত হয়; কাজেই এই কিতাব পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। রমযান মাসে এর তিলাওয়াত করা একান্ত আবশ্যক, যাতে সারা বছর এর প্রতি তোমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে।

মহানবী (সা.)-এর (জীবনের) শেষ রমযানে জিবরাঈল (আ.) তাঁকে দু'বার সম্পূর্ণ কুরআন করীম পুনরাবৃত্তি করিয়েছেন। তাই, এ সুন্নতের অনুসরণে একজন মু'মিনের সম্পূর্ণ কুরআন (খতম) দুই বার পাঠ করার চেষ্টা করা উচিত। যদি (সম্পূর্ণ কুরআন) দুই বার নাও পারে, তবে কমপক্ষে এক বার যেন নিজে অবশ্যই পুরো কুরআন পড়ে । এছাড়া দরস এবং তারাবীহ্‌র ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে যোগদান করুন এবং (কুরআন) শুনুন। অনেকেই কর্মক্ষেত্রে গিয়ে থাকেন। তারাও আসা-যাওয়ার সময় নিজেদের গাড়িতে ক্যাসেট ও সিডি লাগিয়ে শুনতে পারেন। এভাবে এই মাসে যত বেশি পবিত্র কুরআন পাঠ করা, এবং শোনা সম্ভব তা পাঠ করা ও শোনা উচিত।

এছাড়া, শুধু কুরআন তিলাওয়াতই নয়, বরং এতে বর্ণিত আদেশ-নিষেধসমূহ সন্ধান করা উচিত। এরপর, সারা বছর সেই সন্ধানপ্রাপ্ত বিধি-নিষেধের উপর অনুশীলন করার চেষ্টা করা উচিত। অতঃপর এসব নির্দেশাবলীর ক্ষেত্রে উন্নত থেকে উন্নততর মান অর্জনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। তবেই রমযানের গুরুত্বও স্পষ্ট হবে, আর রোযা ও ইবাদত যথার্থভাবে পালিত হবে। কেননা, যে কাজটি করছি এর উদ্দেশ্য কি, এবং খোদা তাআলা কেন শরিয়তের বিভিন্ন শিক্ষা নাযিল করেছেন, তা জানা না থাকলে এসব বিধি-বিধান সঠিকভাবে পালিত হতে পারে না; বরং কি করতে হবে তাও জানা যাবে না। যদি কেবল এটিই শুনেন যে, 'তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হও, সৎকর্ম কর' অথচ এটি জানা না থাকে যে, 'তাক্বওয়া কাকে বলে আর সৎকর্মই বা কী? তাহলে এটি একটি অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। রমযানের দিনগুলোতে বক্তৃতাদি বা খুতবা শুনে যদি চলে যান তাহলে একটি কাজ হয়তো হবে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অর্জিত হবেনা। এ জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন প্রকৃত মুসলমান তারা,

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ

(সূরা আল্ বাকারা:১২২)

অর্থাৎ **'যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা একে যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে।'** অর্থাৎ, গভীর মনোযোগ ও অভিনিবেশের সাথে যেন নিয়মিত তিলাওয়াত ও তদনুযায়ী আমলেরও চেষ্টা করা হয়।

হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) বলেছেন, বরং পবিত্র কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে, **'একে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ করো না।'** অতএব, কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুর মত বর্জন না করে (এর প্রতি) অভিনিবেশ করা এবং তিলাওয়াত করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

আমি যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি, তাতে আল্লাহ্‌ তাআলা

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

বলার পর বলেছেন,

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

অর্থাৎ মানুষের হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, এতে হেদায়াতের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে আর সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যসূচক বিষয়াদিও বর্ণিত হয়েছে। কাজেই, যতক্ষণ সঠিকভাবে এর তিলাওয়াত না করা হবে, হেদায়াতের খুঁটিনাটিও জানা যাবে না, আর সত্য ও মিথ্যার ভেতর পার্থক্যও সুস্পষ্ট হতে পারে না। অতএব, প্রকৃতপক্ষে রোযা রাখতে হলে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও এর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে অবগত হবার চেষ্টা করা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক।

পবিত্র কুরআন পাঠ করা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা অন্যত্র এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে,

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ

(সূরা আন্ নাম্ল:৯২-৯৩)

অর্থাৎ **'এবং আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত হই এবং কুরআন তিলাওয়াত করি।'** অতএব, খোদা তাআলা যে পূর্ণাঙ্গীন শরিয়ত মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যা আমরা মানার দাবী করি, একই সাথে যুগ মসীহ্‌ ও মাহদীকে মানার ঘোষণাও দেই; তাই এই পরিপূর্ণ কিতাব, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন যথাযথভাবে তিলাওয়াতের চেষ্টা করুন, এরই নাম প্রকৃত আত্মসমর্পণ। আর যেখানে এই রমযানে নিয়মিতভাবে কুরআন পাঠের অঙ্গীকার করবেন এবং পাঠ করবেন, সেখানে এই অঙ্গীকারও করুন যে, রমযানের পরেও আমরা দৈনিক এর তিলাওয়াত করব এবং নিজের প্রতি তিলাওয়াত করা আবশ্যক করে নিব। একই সাথে এর বিধি-নিষেধ মোতাবেক চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। কেননা, এটিই আমাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য দান করবে, এবং এটিই আমাদের রমযান গৃহীত হবার কারণ হবে। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) এ বিষয়টির প্রতিই বিশেষভাবে

আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন: **‘তোমাদের জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এই যে, কুরআন শরীফকে পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় ছেড়ে দিও কেননা এতেই তোমাদের জীবন নিহীত।’** অর্থাৎ এর প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল করা ভুলে যেও না। কেবল পড়া বা তিলাওয়াত করা-ই নয়, বরং এর উপর আমল ও থাকা চাই; নচেৎ মৃতবত হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক জীবন যাকে বলে, তা আর থাকবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়'আতের অঙ্গীকার বৃথা সাব্যস্ত হবে। তিনি (আ.) বলেন, **‘সুতরাং একে অনাবশ্যকীয় বস্তুর মত পরিত্যাগ কর না।’**

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **‘যারা কুরআনকে সম্মান করবে, তারা আকাশে সম্মান লাভ করবে। যারা সকল হাদীস ও কথার উপর কুরআনকে প্রাধান্য দেবে, তাদেরকে আকাশে প্রাধ্যান্য দেয়া হবে।’ (কিশতিয়ে নূহ-রূহানী খাযায়েন-২০তম খন্ড-পৃ:১৩)**

আকাশে সম্মান লাভ করা এবং প্রাধান্য পাওয়ার অর্থ কি? তা হলো, খোদা তাআলা কৃপা করতঃ নিজ নৈকট্য প্রদান করবেন। দোয়া গৃহীত হবার নিদর্শন দেখবে। সমাজের রোগ-ব্যাধি থেকে এই পৃথিবীতে রক্ষা পাবে। অতএব, যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের বলে দিয়েছেন, প্রথম প্রচেষ্টা যদি তোমাদের পক্ষ থেকে হয়, তাহলে আমিও তোমাদের দিকে ছুটে আসবো। এই দৃশ্য দেখার জন্য কুরআনকে আমাদের সম্মান দিতে হবে, যথাযথভাবে এর তিলাওয়াত করতে হবে, এর নির্দেশাবলী মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পুনরায় বলেছেন, **‘মানব জাতির জন্য পৃথিবীতে আজ কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নেই এবং সকল আদম সন্তানের জন্য আজ রসূল (সা.) ব্যতীত অন্য কোন শাফী (সুপারিশকারী) নেই। সুতরাং, তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন ও প্রতাপশালী নবীর সাথে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাউকেই তাঁর উপর কোনভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান কর না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তি-প্রাপ্ত বলে পরিগণিত হতে পার। স্মরণ রেখো! প্রকৃত মুক্তি যে কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশিত হয় তা নয়, বরং প্রকৃত মুক্তি পার্থিব জগতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ করে থাকে। মুক্তি প্রাপ্ত কে? সে-ই যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মাঝে যোজক স্থানীয়** (অর্থাৎ সুপারিশকারী)। **এবং আকাশের নিচে তাঁর সমমর্যাদাসম্পন্ন আর কোন রসূল নেই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নেই। অন্য কাউকেই আল্লাহ্ তাআলা চিরকাল জীবিত রাখতে চাননি, কিন্তু তাঁর এই মনোনীত নবী চিরকালের জন্য জীবিত। তাঁকে চিরকাল জীবিত রাখার জন্য আল্লাহ্ তাআলা এই ব্যবস্থা করেছেন যে, তাঁর শরীয়ত ভিত্তিক আধ্যাত্মিক কল্যাণকে কিয়ামত পর্যন্ত জারী রেখেছেন। পরিশেষে তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণ পৌঁছানোর জন্য এই মসীহ্ মাওউদ কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, যার আগমন ইসলামের প্রাসাদকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। কেননা, এই পৃথিবী লয় হবার পূর্বেই মুহাম্মদী সিলসিলার জন্য একজন আধ্যাত্মিক গুণের মসীহ্কে প্রেরণ করা আবশ্যক ছিল যেভাবে মূসায়ী সিলসিলার জন্য তা করা হয়েছিল।’ (প্রাগুক্ত-পৃ:১৩-১৪)**

অতএব, এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা এই মুহাম্মদী মসীহ্র জামাতভুক্ত হয়ে আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণাঙ্গ শরিয়তের মর্যাদাকে বুঝার অঙ্গীকার করেছি যা পবিত্র কুরআন আকারে আমাদের কাছে সুরক্ষিত আছে। মহানবী (সা.)-এর খতমে নবুয়ত পদবীর বুৎপত্তি লাভ করেছি, কিন্তু অন্যান্য মুসলমানরা এথেকে বঞ্চিত। অতএব, এই সম্মান আমাদেরকে অন্যদের মাঝে সতন্ত্র করে আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বুঝা, এর তত্ত্বকে অনুধাবন এবং এর প্রকৃত সম্মানকে আপন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বরং আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজে যেন এটি প্রকাশ পায়। আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজে যদি এর বহিঃপ্রকাশ না ঘটে, তবে এটি অপ্রয়োজনীয় বস্তুর ন্যায় ছেড়ে দেয়া বৈ-কি।

আর আমি পূর্বেই বলেছি, ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে এরূপ পরিস্থিতির কথা খোদা তাআলা স্বয়ং পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। সূরা আল্ ফুরকানে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

(সূরা আল্ ফুরকান:৩১)

অর্থাৎ **‘আর রসূল (সা.) বলবে হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার জাতি এই কুরআনকে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মত পরিত্যাগ করেছে** (ছেড়ে দিয়েছে)।’ পাঠ করে ঠিকই কিন্তু তদনুসারে কাজ করে না। অতএব এটি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার ব্যাপার আর প্রত্যেক আহমদীর জন্য চিন্তনীয় বিষয়। কারণ, কুরআনের অনুশাসন শিরোধার্য করার জন্যই তো আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যুগ ইমামকে মানার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আমাদেরকে এই অনুপম শিক্ষানুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করতে হবে। অতএব, এ সুমহান এবং অনন্য গ্রন্থকে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর ন্যায় পরিহার করা হতে রক্ষা পাওয়া মূলতঃ নির্ভর করে এই পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত এবং সেই শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপর।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে এক স্থানে বলেছেন: **‘স্মরণ রেখ! কুরআন শরীফ প্রকৃত কল্যাণরাজীর**

উৎসস্থল এবং মুক্তির সত্যিকার উপায়। যারা পবিত্র কুরআনের উপর আমল করে না এটি তাদের নিজেদেরই ভ্রান্তি। যারা এর উপর আমল করে না তাদের একটি দল এতে বিশ্বাসই রাখে না উপরন্তু তারা একে খোদা তাআলার ঐশীবাণী মনে করে না। এরা অনেক দূরে পড়ে আছে। কিন্তু যারা এটিকে আল্লাহ্ তাআলার (কালাম) বাণী এবং মুক্তির নিরাময়ী এক ব্যবস্থাপত্র বলে বিশ্বাস করে, তারা যদি এর উপর আমল না করে তবে এটি কত আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয়। এদের ভেতর অনেক এমনও আছে যারা সারা জীবনে কখনো এটি পড়েও নি। অতএব, যারা খোদা তাআলার বাণী সম্পর্কে এমন উদাসীন ও ভ্রুক্ষেপহীন, তাদের দৃষ্টান্ত এমন একজন মানুষের মত– যে জানে অমুক ঝর্ণাটির পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ, সুমিষ্ট, সুশীতল, অনেক রোগের মহৌষধ এবং আরোগ্য।' (তারা জানে যে, এটি অত্যন্ত সুমিষ্ট পানির ঝর্না। ঠাণ্ডা ও মিষ্টি পানি যা অনেক রোগের জন্য চিকিৎসাস্বরূপ)

এবং **'তার এই নিশ্চিত জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু এই সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকার পরও পিপাসার্ত হওয়া এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সে (ঝর্ণার) কাছে যায় না। এটি তার কতবড় দুর্ভাগ্য ও অজ্ঞতা। অথচ তার সেই ঝর্ণা থেকে তৃপ্তি সহকারে পান করা আর এর সুস্বাদ ও নিরাময়ী পানিকে উপভোগ করা উচিত ছিল। কিন্তু জানা সত্ত্বেও সে তা থেকে এক অজ্ঞের ন্যায় দূরে অবস্থান করেছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু এসে তাকে ধ্বংস করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এর থেকে দূরে অবস্থান করে। এই ব্যক্তির অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা এমনই। তারা জানে, এই কুরআন শরীফই সমস্ত উন্নতি ও সফলতার চাবিকাঠি, যার উপর আমাদের আমল করা উচিত। কিন্তু না! এর প্রতি ভ্রুক্ষেপই করা হয় না। এক ব্যক্তি যে পরম সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্খীতার প্রেরণা নিয়ে এ দিকে ডাকে আর নিছক সহানুভূতিই নয় বরং খোদা তাআলার নির্দেশ ও ইঙ্গিত অনুযায়ী এর প্রতি আহবান করে তাঁকে মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল (কায্যাব ও দাজ্জাল) অভিহিত করা হয়।'** (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের সম্পর্কে বলছেন যখন আমি একান্ত বেদনার সাথে তোমাদের অর্থাৎ মুসলমানদেরকে আমার দিকে আহ্বান করেছি যে, পবিত্র কুরআনের উপর আমল করো তখন আমাকে কায্যাব, মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল আখ্যা দেয়া হয়) তিনি (আ.) বলেন, **'এই জাতির জন্য এর চেয়ে করুণ অবস্থা আর কি হতে পারে।'** তিনি (আ.) বলেন, **'মুসলমানদের উচিত ছিল, আর এখনও তাদের এই ঝর্ণাকে এক মহান নিয়ামত মনে করা উচিত এবং এর মূল্যায়ন করা আবশ্যক। এর মূল্যায়ন হলো, এর শিক্ষার উপর আমল করা এরপর তারা বুঝতে পারবে যে, খোদা তাআলা কীভাবে তাদের বিপদাপদ ও সমস্যাবলী দূর করেন। হায়! মুসলমানরা যদি বুঝতো আর চিন্তা করতো যে আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য একটি পুণ্যের পথ খুলেছেন আর তারা এ পথে পরিচালিত হয়ে যদি লাভবান হত! (মলফুযাত-৪র্থ খন্ড-পৃ:১৪০-১৪১- রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত)**

এই উদ্ধৃতিতে, যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মুসলমানদের অবস্থার চিত্র অঙ্কন করেছেন আর পরিতাপ করেছেন, সেখানে আমাদের দায়িত্বও বেড়ে যায়। এই আকর্ষণীয় শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে আমাদের এতটা প্রতিফলিত করা উচিত, যাতে কতক মুসলমান গোষ্ঠির অপকর্মের কারণে অমুসলমানরা ইসলাম ও কুরআনের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশের যে ধৃষ্টতা দেখায় সে সুযোগ যেন আর না থাকে। আহমদীদের ব্যবহার দেখে তারা যেন নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। আর আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় অনেক আহমদী আছেন যারা পবিত্র কুরআনের অনুপম শিক্ষা জগতের সামনে তুলে ধরে, মানুষের সামনে তুলে ধরে। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে যখনই আমাদের জলসা বা সেমিনার হয় তাতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা উপস্থাপন করা হয় ফলে অমুসলমানরা প্রকাশ্যে এ অভিমত ব্যক্ত করে যে, ইসলামী শিক্ষার এই চেহারা আজ আমরা প্রথমবার দেখলাম। অতএব, আমরা যদি এ বিষয়গুলোকে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত করি, তাহলে কেবলমাত্র শিক্ষা শোনানোই নয় বরং এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনকারীও হবো।

অনুরূপভাবে, আহমদীদেরকে স্ব স্ব গন্ডিতে মুসলমানদের কাছেও এই শিক্ষা এভাবে পৌঁছানোর চেষ্টা করা উচিত যে, তোমরা আমাদের সাথে মতবিরোধ রাখতে চাও রাখো, কিন্তু ইসলামের নামে ইসলামের উৎকর্ষ শিক্ষার দুর্নাম করো না। তোমাদের জন্য এতেই মুক্তি নিহিত। তোমরা শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনকে মানার (মৌখীক) দাবী করো না, বরং এর শিক্ষার প্রতি অভিনিবেশ কর। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে অবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন, আর মুসলমানদের যে সব বিপদাপদ ও সমস্যাদির কথা বর্ণনা করেছেন, তা আজও সেভাবেই বিদ্যমান রয়েছে বরং অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা অধিক শোচনীয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে অবলম্বন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্যাদী ও বিপদসঙ্কুল যুগ থেকে মুসলমানরা নিস্কৃতি পাবে না। কেবল ইসলামের নাম জপলেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইসলামের অনুপম শিক্ষাই এর সৌন্দর্যের পরিচয়। কোন আলেম নিজ থেকে পবিত্র কুরআনের তফসীর করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তাআলার পক্ষ থেকে তাকে সেই পন্থা না শিখানো হয়।

আর এ যুগে তা আল্লাহ্ তাআলা তাঁকেই শিখিয়েছেন যাঁকে এরা দাজ্জাল (প্রতারক), কায্‌যাব (মিথ্যাবাদী) না জানি আরও কত কিছু বলে!

আল্লাহ্ তাআলাই এদের প্রতি করুণা করুন আর তাদেরকে কান্ডজ্ঞান দিন। আর আমাদেরকে পবিত্র কুরআন যথাযথ তিলাওয়াত ও এর শিক্ষার উপর পূর্বের চেয়ে অধিক সচেতনতার সাথে প্রতিষ্ঠিত হবার তৌফিক দান করুন। আমরা যেন এর সম্মান প্রতিষ্ঠাকারী হই ও একে সর্বদা শ্রেষ্ঠত্ব দেই। এই সম্মান কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে আর একে কীভাবে প্রাধান্য দেয়া যায় তা আমি পূর্বেই বলেছি। এ সম্পর্কে স্বয়ং পবিত্র কুরআন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিক্ষার আদলে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

আমি এখানে সংক্ষেপে কতক আয়াত বা আয়াতাংশ উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্ তাআলাকত সুন্দরভাবে (এতে) পবিত্র কুরআনের মর্যাদা এবং এর সুমহান শিক্ষা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আজ হয়তো এ বিষয়টি শেষ হবে না, অর্থাৎ যে দিকটা আমি বর্ণনা করতে চাচ্ছি তা শেষ হবে না; নতুবা পবিত্র কুরআন এমন এক সমুদ্র, যদি মানুষ তা বর্ণনা করা আরম্ভ করে তা কখনও শেষ হবার নয়। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষ যখন এ নিয়ে প্রণিধান করে নিত্য নতুন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে।

সর্ব প্রথম বিষয় হলো– পবিত্র কুরআন পাঠ করার আদব বা রীতি কি? আর পবিত্র কুরআন পাঠের পূর্বে মন-মস্তিষ্ককে কীভাবে পরিস্কার করা উচিত? সে সম্পর্কে প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(সূরা আন্ নাহ্‌ল:৯৯)

'সুতরাং যখন তুমি কুরআন পাঠ করো তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করো।'

আমরা জানি যে, মানুষকে তাক্‌ওয়ার পথ থেকে বিচ্যুত করার ব্যাপারে শয়তান প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে, একটি খোলা চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। আর পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ যার প্রতিটি অক্ষর খোদার পানে পথের দিশা দেয় আর তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিতকারী এবং আল্লাহ্ তাআলার দিকে যাবার পথ দেখিয়ে থাকে। তাই খোদা তাআলা বলেছেন– যদি তুমি খোদা তাআলার নৈকট্যের উন্নত মানে অধিষ্ঠিত হতে চাও আর পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শিক্ষা বুঝতে চাও, তাহলে পবিত্র কুরআন পাঠ করার পূর্বে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তাআলার নিকট এ প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও আক্রমন হতে রক্ষা করেন, আর যা তুমি পড়ছ সে শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হবার সামর্থ দান করেন। কেননা এটি এমন এক অমূল্য ধনভান্ডার, যা পর্যন্ত পৌঁছার পথে শয়তান হাজারো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

অতএব, যদি শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য দোয়া না কর তাহলে তুমি বুঝতেই পারবে না- শয়তান তোমাকে আল্লাহ্ তাআলার বাণী বুঝার ক্ষেত্রে কখন– কীভাবে বাঁধা দিয়েছে। শয়তানের খপ্পরে পড়ার কারণে আল্লাহ্ তাআলার কালাম (বাণী) হওয়া সত্ত্বেও এ কালাম পড়ে তোমরা নির্দেশনা লাভ করতে সক্ষম হবে না। তাই, প্রথম বিষয় হলো- আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয়ে এসে আন্তরিকভাবে পবিত্র কুরআন পাঠ করা, অন্যথায় এটি বুঝবে না। তাই আল্লাহ্ তাআলা এক স্থানে বলেছেন-

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

(সূরা বনী ইসরাঈল-৮৩)

অর্থাৎ 'এই কুরআন যালেমদেরকে কেবল ক্ষতিতেই বৃদ্ধি করে।' অথচ মু'মিনদের জন্য এটিই কল্যাণের মাধ্যম।

পুনরায় আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

(সূরা আল্ মুয্‌যাম্মেল:২১)

অর্থাৎ **'আল্লাহ্ রাত ও দিনের পরিমাণকে নির্ধারণ করেন** (আয়াতের প্রথমাংশ আমি ছেড়ে দিচ্ছি)। **এবং তিনি জানেন তোমরা কখনও সময় গণনা করতে পারবে না, সুতরাং তিনি তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করলেন। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটা সম্ভব আবৃত্তি কর। তিনি এটিও জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কতক অসুস্থ্য হবে এবং কতক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণে ভূপৃষ্ঠে ভ্রমন করবে।'** এরপরেও কতক দিকনির্দেশনা রয়েছে। এর পূর্বের আয়াতে তাহাজ্জুদের (নফলের) প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন- এতে কুরআনের যতটা মুখস্থ আছে তা পাঠ কর, এছাড়া অভিনিবেশের উদ্দেশ্যে যতটুকু কুরআন পড়তে পার– ততটুকু পড়া উচিত। একজন মু'মিনের এটিই কাজ

تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

এর অর্থ নিছক এটিই করা উচিত নয় যে, যতটুকু আমাদের মুখস্থ আছে ততটুকুই যথেষ্ট– তাই পড়েছি এর বেশি মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। অথবা (কুরআন সম্বন্ধে) যতটুকু শিখেছি তাই যথেষ্ট, এর বেশি শেখার প্রয়োজন নেই; বরং যতদূর সম্ভব, এক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তাআলা অপর একস্থানে বলেছেন,

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

(সূরা আল্ মায়েদা:৪৯)

অর্থাৎ পুণ্যকর্মে প্রতিযোগিতা কর। আর

যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পুণ্য্য বা নেকী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ না হবে, কোন্ কোন্ কাজকে পবিত্র কুরআন পুণ্যকর্ম বলেছে তা যদি জানা না থাকে তাহলে প্রতিযোগিতা করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? অতএব, কুরআন করীম পাঠ করা, শেখা ও এর উপর চিন্তা ও প্রণিধান করা একান্ত আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপর ইলহাম হয়েছিল, **'আল খাইরু কুল্লুহু ফিল কুরআন'** অর্থাৎ সকল আশিস ও কল্যাণ পবিত্র কুরআনে নিহিত রয়েছে।

অতএব, এখানে 'তাইয়াস্‌সার' (যতটা সম্ভব) অর্থ এই নয় যে, আর শেখার প্রয়োজন নেই, যা মুখস্থ আছে তাই যথেষ্ট! বরং নিজের যোগ্যতা ও জ্ঞান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা উচিত, যাতে পবিত্র কুরআন থেকে উত্তরোত্তর অধিক কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হয়। এছাড়া অন্যান্য অবস্থার কথাও কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, যেমন তোমরা অসুস্থ্য থাকবে, রোগাক্রান্ত হবে কিংবা সফরে গেলে পরিস্থিতি অনুযায়ী নামায ছোট-বড় হয়, কুরআন (পাঠে) কমবেশিও হয়ে থাকে। কিন্তু এর অর্থ কখনোই এই নয় যে, কুরআন যতটুকু শিখেছি– শিখেছি আর শেখার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

(সূরা আল্ মুযযাম্মেল:৫)

'অথবা এরচেয়ে কিছু বাড়াও আর সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করো।' অর্থাৎ এমনভাবে তিলাওয়াত করো যেন এক একটি শব্দ স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত হয়, বোঝা যায় আর সুললিত কণ্ঠে পাঠ করা হয়। তাড়াহুড়ো করে পড়ে নিলাম এমনটি যেন না হয়। যেমন পূর্বেও একবার আমি বলেছি, অন্যান্য মুসলমানরা তারাবীহ্‌তে এত দ্রুত তেলাওয়াত করে যে, কিছুই বোঝা যায় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন: **'সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করাও ইবাদত।'** (আল্ হাকাম-২৪ মার্চ, ১৯০৩)

একটি হাদীসে এসেছে, হযরত সাঈদ বিন আবু সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করে না, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।'** *(সুনান আবু দাউদ)*

অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন:

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ

(সূরা আল্ বাকারা:২৩২)

অর্থাৎ, **'এবং তোমরা আল্লাহ্ তাআলার সেই নিয়ামতকে স্মরণ কর– কিতাব ও প্রজ্ঞা থেকে যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যদ্বারা তিনি তোমাদের নসীহত করেছেন।'** অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলার যেসব নির্দেশ রয়েছে তার সবই তোমাদের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত। সূরা নূরের প্রারম্ভে বলে দিয়েছেন, তোমাদের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে তাতে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা রয়েছে; তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো। যতক্ষণ পর্যন্ত পাঠ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ নিয়ামতরাজি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে না– তা বুঝবে না। অতএব, পবিত্র কুরআন পাঠ করা মূলতঃ উপদেশ গ্রহণ করা আর একজন মু'মিনের জন্য এটি একান্ত আবশ্যক। কেননা এটিই মানুষকে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নত করে।

আল্লাহ্ তাআলা অপর একস্থানে বলেন:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا

آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ‎:‎

(সূরা সাদ:৩০)

'আমরা তোমার প্রতি এই কল্যাণময় গ্রন্থ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে লোকেরা এর আয়াতসমূহকে অনুধাবন করে আর ধীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা গ্রহণ করে।' অতএব, পবিত্র কুরআনের মান্যকারী ও এর পাঠকই বুদ্ধিমান বা ধীসম্পন্ন। কি কারণে বুদ্ধিমান? এজন্য যে, এতে বিগত সকল নবীর শিক্ষা সমূহের সেসব বিষয়াদিও সন্নিবেশিত হয়েছে যা আল্লাহ্ তাআলা বলবৎ রাখতে চেয়েছেন, যেগুলো যুগোপযোগী সঠিক শিক্ষা। আর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিক্ষামালা অথবা সেসব বিষয়েরও উল্লেখ রয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য আল্লাহ্ তাআলা প্রয়োজনীয় মনে করেছেন, অর্থাৎ তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি তা অবতীর্ণ করেছেন। অতএব, পবিত্র কুরআন যে ঘোষণা দিয়েছে তার প্রতি অভিনিবেশ করো, শিক্ষা গ্রহণ করো, কেননা এটিই বুদ্ধিমানের কাজ। এ ঘোষণার উপর আমরা তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো, যখন স্বয়ং আমরা এ শিক্ষা নিজেরা শিরোধার্য করবো।

এরপর তিলাওয়াত কীভাবে শোনা উচিত এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ

وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(সূরা আল্ আ'রাফ:২০৫)

'এবং যখন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা তা গভীর মনোযোগের সাথে শোন এবং নিরব থাক, যেন তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হয়।' প্রতিটি আহমদীর হৃদয়ে পবিত্র কুরআনের প্রতি এই মর্যাদা বা সম্মান সৃষ্টি করতে হবে, আর নিজেদের সন্তান-সন্ততির মাঝেও এর গুরুত্ব স্পষ্ট করতে হবে। অনেকেই অসতর্কতা প্রদর্শন করে, তিলাওয়াতের সময় ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মগ্ন থাকে, কোন কোন বাড়ির টিভিতে অনেক সময় কুরআন তিলাওয়াত হতে থাকে অথচ ঘরের লোকজন ব্যক্তিগত কথা-বার্তায় মশগুল থাকে। নিরবতা অবলম্বন করা উচিত,

হয় নিরবে তিলাওয়াত শুনুন, অথবা জরুরী কথা বলার প্রয়োজন হলে, যদি একান্ত কথা না বললেই নয় তবে টিভির আওয়াজ বন্ধ করে দিন। অমুসলমানদের প্রেক্ষাপটেও একই নির্দেশনা রয়েছে, যদি নিরবতার সাথে এ কালাম (কুরআন) শোনে, তবে তারাও বুঝতে পারবে যে, কীরূপ মহান বাণী এটি। আল্লাহ্ তাআলা এ কারণে তাদের প্রতিও করুণা করতঃ হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। অতএব, আল্লাহ্ তাআলার কালামকে নিরবতার সাথে শুনা ও বুঝার, আর বেশি বেশি আল্লাহ্ তাআলার রহমত লাভের মানসে আমাদের মাঝে গভীর সচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত।

এরপর অন্যত্র আল্লাহ্ তাআল াবলেছেন:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ

وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(সূরা হূদ:১১৩)

'অতএব তোমাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়, তুমি এর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও, আর তারাও যেন প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা তোমার সাথে তত্তবা করেছে আর সীমাতিক্রম করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা ঐ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত যা তোমরা কর।'

এটি সূরা হুদের আয়াত। এই নির্দেশ শুধু মহানবী (সা.)-এর জন্যই ছিল না, এমনিতেও মহানবী (সা.)-এর প্রতি যত নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে তা তাঁর উম্মত ও তাঁর মান্যকারীদের জন্যই। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে মু'মিন ও অনুশোচনাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ সমুদয় নির্দেশের উপর (নিজেরাও) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও এবং অন্যদেরও করাও। আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখ, কেবলমাত্র ইবাদতের উপরেই নির্ভর করবে না, বরং মূল বিষয় সন্ধান কর যা এর প্রাণ, আর তা হল, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করা। খোদা তাআলা মহানবী (সা.)-কে এ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, যারা এ দাবী করে যে, আমরা তওবা করেছি, তারাও যেন আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখা সম্বন্ধে অবগত হয় এবং বুঝে। আর এ সম্পর্কে বেশি বেশি জ্ঞান লাভ করে, উপরন্তু কখনোই এটি লঙ্ঘন করার স্পর্ধা না দেখায়, তবেই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ হতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের আর একটি দায়িত্ব হলো– নিজ সন্তান-সন্ততির এমনভাবে তরবিয়ত করা, যাতে তারা আল্লাহ্ তাআলার এ কালামকে বুঝার, প্রণিধান করার ও নিজেদের জীবনে এ শিক্ষা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একস্থানে বলেন: **'আমার গভীর আক্ষেপ হয় যখন দেখি যে, মুসলমানরা মৃত্যু সম্পর্কে হিন্দুদের মতও সচেতন নয়। রসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখ! কেবল একটি নির্দেশ** فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ **'ই তাঁকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। মৃত্যুর কত গভীর উপলব্ধি। তাঁর অবস্থা কেন এমন হয়েছিল? কেবল এ জন্য, যাতে আমরা এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করি।'** মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন এ নির্দেশ আসে তখন তিনি (সা.) বলেন, এ আয়াতটি আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। কেন (বলেছেন)? যেন তাঁর মান্যকারী উম্মত এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তিনি (সা.) তাদের কথা চিন্তা করতেন। তিনি (আ.) বলেন, **' রসূলে করীম (সা.)-এর পুত পবিত্র জীবনের এর চেয়ে বড় আর কী প্রমাণ হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলাতাঁকে সর্বোত্তম পথ প্রদর্শক তথা কিয়ামত পর্যন্ত গোটা বিশ্বের জন্য মনোনীত করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী একটি ব্যবহারিক শিক্ষার সমষ্টি। যেভাবে পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তাআলার উক্তি ভিত্তিক গ্রন্থ আর প্রাকৃতিক নিয়মাবলী (কানুনে কুদরত) হচ্ছে তাঁর ব্যবহারিক গ্রন্থ, অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর জীবন একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ যাকে পবিত্র কুরআনেরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বলা যায়।'** [তফসীর **হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), সূরা হূদ:১১৩, ২য় খন্ড-পৃ:৭০৪]**

এ বিষয়ে আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেছেন: **'রসূলুল্লাহ্ (সা.) মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। কেননা এই নির্দেশের মাধ্যমে অনেক গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। মানুষের নিজের যতটুকু সম্পর্ক আছে, স্বয়ং নিজেকে ঠিক করা আর আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলী পূণরূর্পে অনুসরণ করা সম্ভব। কিন্তু অন্যদেরকেও অনুরূপ বানানো সহজ কাজ নয়। এর মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর সুউচ্চ মর্যাদা এবং পবিত্র করণশক্তি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। দেখুন তিনি (সা.) এই নির্দেশ কত সফলরূপে পালন করেছেন। সম্মানিত সাহাবীদের এমন একটি পবিত্র জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন যাদেরকে**

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

(সূরা আল্ ইমরান:১১১)

বলা হয়েছে আর

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

(সূরা আল্ মায়েদা:১২০)

এর উপাধি তারা লাভ করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় পবিত্র মদীনাতে কোন মুনাফিক বা কপট ছিল না। মোটকথা, এমন সফলতা তিনি লাভ করেছেন যার দৃষ্টান্ত অন্য কোন নবীর জীবন চরিতে দেখা যায় না। এতে আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য এটিই ছিল যে, 'শুধু কথার মাঝে বিষয় সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়।' কেননা

(তা যদি) কেবল কথার খৈ ফুটানো এবং লোক দেখানো পর্যন্তই যদি বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকে তবে আমাদের ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য কি থাকল? অন্যদের উপর কী বিশেষত্ব থাকবে?' (আল্ হাকাম-৫ম খন্ড, নাম্বার-২৯, ১০ আগষ্ট,১৯০১-পৃ:১ এবং প্রাগুক্ত-পৃ:৭০৪-৭০৫)

অতএব, আজ আমাদের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য, কেবল বুলি সর্বস্ব হলেই চলবে না বরং আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলী বুঝে সে অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা উচিত, কেননা এটিই আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ। যেমন একস্থানে তিনি বলেন:

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ
فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

(সূরা আল্ আন্'আম:১৫৬)

'এবং এটি একটি আশিষমন্ডিত কিতাব, যা আমরা নাযিল করেছি, সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর আর তাক্বওয়া অবলম্বন কর যেন তোমাদের প্রতি দয়া করা যায়।'

আরও একটি বিষয় যা আমাদের সমাজের জন্য, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আবশ্যক তা আমি এখানে উল্লেখ করছি, যদিও পূর্বেই উল্লেখ করা আবশ্যক ছিল, আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَاِذَا جَاۤءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ
مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْۤءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ
مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(সূরা আল্ আন্'আম:৫৫)

'যারা আমাদের আয়াত সমূহের প্রতি ঈমান এনেছে তারা যখন তোমার নিকট আসে তাদেরকে বল, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক'। তোমাদের প্রভু তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করার বিষয়টি নিজের পক্ষ থেকে অবধারিত করে নিয়েছেন। অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কাজ করে এরপর যদি সে তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

অতএব, এই অনুপম শিক্ষাই সমাজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যদি পরস্পরকে শান্তির বাণী প্রেরণ করতে থাকেন তাহলে পারস্পরিক বিদ্বেষ, অভিযোগ এবং দূরত্ব আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে, আর হওয়া উচিৎ। এর ফলে যেসব ভাই-ভাই পরস্পর বিবাদে লিপ্ত, এবং যাদের মাঝে বিভিন্ন অসন্তোষ রয়েছে, তাদের ভেতর আপোষ হয়ে যাবে। আমাদের দাবী হলো, আমরা আহমদী এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখি, আর এর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপনের চেষ্টা করি। প্রশ্ন হলো, কুরআন বলে– মীমাংসা কর, তাসত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।

অতএব, চিন্তা-ভাবনা করা উচিৎ। আর নিজেদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্বার্থে পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা এবং এর নির্দেশাবলীকে জলাঞ্জলি দেয়া উচিত নয়। কাজেই প্রত্যেক আহমদীকে বুঝে-শুনে পবিত্র কুরআন পাঠ করা উচিত। এটি এমন এক সুমহান গ্রন্থ যাতে এমন কোন দিক নেই যা বর্ণিত হয়নি। তাই সমাজের শান্তি, নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং খোদার নৈকট্য লাভের জন্যও, আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী চিহ্নিত করে তার প্রতি আমল করার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। আর এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবো এবং এর প্রতি গভীর অভিনিবেশ করবো। আমি পূর্বেই বলেছি, সব কথা বলা সম্ভব নয়। কিছু উল্লেখ করেছি, বাকী ইনশাল্লাহ্ আগামীতে বলবো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **'কুরআন শরীফের প্রতি গভীর অভিনিবেশ করো– এতে সব কিছু রয়েছে। পাপ–পুণ্যের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে আর ভবিষ্যতের খবরাখবর ইত্যাদিও আছে। ভালোভাবে জেনে রাখ! এটি সেই ধর্ম উপস্থাপন করে যার উপর কোন আপত্তি হতে পারে না। কেননা এর আশিস ও ফলসমূহ সকল ঋতুতে সতেজ পাওয়া যায়। ইঞ্জিলে ধর্মকে পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়নি। এর শিক্ষা সে যুগের উপযোগী হতে পারে, কিন্তু তা কখনোই সকল যুগ ও সকল পরিস্থিতি অনুযায়ী নয়। এ গৌরব কেবল পবিত্র কুরআনেরই, কেননা আল্লাহ্ তাআলা এর মাঝে সকল রোগের চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন আর সকল বৃত্তির পরিচর্যা বাতলে দিয়েছেন। এছাড়া যেসব পাপের কথা উল্লেখ করেছেন তা দূর করার উপায়ও বলে দিয়েছেন। তাই পবিত্র কুরআন পাঠ করতে থাকো, এবং দোয়া অব্যাহত রাখ; আর স্বীয় আচার-আচরণকে কুরআনের শিক্ষার অধীনস্ত রাখার চেষ্টা কর।**

(মলফুযাত-৫ম খন্ড, পৃ:১০২-নবসংস্করণ)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে কুরআন পড়ার, বোঝার এবং এর প্রতি আমল করার তৌফিক দান করুন। আমরা নিজেরাও যেন এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। নিজেদের বংশধরদেরকেও কুরআনের অনুপম শিক্ষার প্রতি মনোযোগী করুন এবং তাদের হৃদয়ে কুরআনের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টিকারী হোন, আমীন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ এবং কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের যৌথ উদ্যোগে অনূদিত)

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولـه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (آمين)

প্রকৃত কুরবানীর ঈদ তাদেরই যারা এর প্রকৃত সূক্ষ্ম বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করে

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২০০৮ সালের ঈদুল আযহিয়ার খুতবা।

আজ আমরা আল্লাহ তাআলার ফজলে এখানে ঈদুল আযহিয়া উদযাপন করার জন্য একত্রিত হয়েছি। আমাদের এলাকাতে অর্থাৎ পাকিস্তানে ও হিন্দুস্তানে একে 'কুরবানীর ঈদ' এমনকি 'বড় ঈদ'-ও বলা হয় আর, যদিও এ ঈদকে কুরবানীর ঈদ বলা হয় কিন্তু চিন্তা ভাবনা করলে বোঝা যায় 'ঈদুল ফিতর'ও কুরবানীরই এক ঈদ স্বরূপ, যা উদযাপনের পূর্বে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষ বিশেষ এক মাসে নিজেই নিজেকে এক নির্দিষ্ট সময় অবধি বৈধ কাজ থেকেও বিরত রাখে। নিজ আত্মার অনেক অধিকার বিসর্জন দিয়ে থাকে । নিজ ইবাদতের মান উন্নত করে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে ত্যাগের এ অধিকার অর্জনে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে। রাতে উঠে এমন লোকেরাও আল্লাহর নিকট ক্রন্দন করে যারা সাধারন অবস্থায় হয়তো কেবল ফজর নামাজের জন্য জাগ্রত হয়। আল্লাহ তাআলা এ মাসের শেষে যাকে রমজান মাস বলা হয় উক্ত ত্যাগের শেষ মুহূর্তে ঈদ উদযাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভাল কাপড় পরিধান কর , পানাহার কর, এক জায়গায় একত্রিত হও এবং দুই রাকাত ঈদের নামাজ আদায় কর। আর আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

সুতরাং সেই দিন গুলোতে লোকেরা এক মাস পর্যন্ত নিজেদের বৈধ অধিকারগুলো কুরবানী করে থাকে। দিনের এক অংশে ক্ষুধা, পিপাসা আর অন্যান্য অনুভূতির কুরবানী দিয়ে থাকে। যা বিভিন্ন মৌসুম অনুযায়ী দৈনিক দশ থেকে আঠার ঘন্টার কুরবানী । এর পর রাতে বিশেষ মনোযোগ সহকারে ইবাদত করে থাকে এবং আত্মাকে সজীব করে থাকে। এ কুরবানীর মাধ্যমে মু'মিনের জীবনে আরও এমন এক বিপ্লব সাধিত হয় যা তাকে খোদা তাআলার নিকটবর্তী করে দেয়। আর এক নতুন অধ্যায় এবং নতুন জগতে সে স্থানান্তরিত হয়। নিজ আত্মার কুরবানী করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। এটাও ঠিক যে, অনেক লোক এমনও আছেন যারা নিজের আত্মার সংশোধনের জন্য গুরুত্ব সহকারে এ কুরবানী করেনা, কেননা, গুরুত্ব সহকারে কেবল এক মু'মিনই ইবাদত করে থাকে। তবুও এরা সকলে এভাবেই ঈদ উদযাপন করে থাকে, যেন প্রকৃত এক কুরবানী এক মাস ধরে কেবল ঐ সকল লোকেরাই করেছে। যাই হোক, তাদের ঈদ উদযাপন রীতি আর শোরগোল ছাড়া বিশেষ কোন গুরুত্ব রাখেনা। প্রকৃত ঈদ তাদেরই হয়ে থাকে যারা কুরবানীর মর্মকে বুঝে ব্যক্তিগত কুরবানীর মধ্য দিয়ে এক মাস অতিক্রান্ত করার পর ঈদ উযাপন করে থাকে। যাই হোক আমি যে বলছিলাম, আজ আমরা যে ঈদ উদযাপন করছি একে কুরবানীর ঈদ বলা হয়, আমি আরও বলেছি যে, ঈদুল ফিতরও এক কুরবানীর ঈদ কিন্তু তা ব্যক্তিগত কুরবানীর এক ঈদ। কিন্তু এ ঈদুল আযহিয়া যা কিনা সমষ্টিগত এবং জাতীয়ভাবে কুরবানী প্রদানের খুশির এক ঈদ। যে ব্যক্তিসত্তা এ ঈদ উদযাপনে অন্তর্ভূক্ত থাকে অথবা কতিপয় লোক যারা এ ঈদের আনন্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাদের উদ্দেশ্যও এক-ই জাতীয় এবং

পারস্পরিক সম্প্রীতির বিপ্লব সাধন করা। যেভাবে প্রকৃত ঈদুল ফিতর ঐ সকল লোকেরই হয় যারা রুহানী ভাবে উন্নতির উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত কুরবানী করে থাকে যার পরিনামে জামা'তের রুহানী মানের অবস্থা উন্নত হয়।

এমনি ভাবে প্রকৃত কুরবানীর ঈদ তাদেরই যারা এর প্রকৃত ও সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করে যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত ইসমাইল (আ.) আর হযরত হাজেরা (আ.) নিজ কুরবানীর মাধ্যমে করেছেন। এ কুরবানীর মাঝে যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিদ্যমান তা প্রত্যেক মু'মিন যদি বুঝার চেষ্টা করে তখনি আমরা প্রকৃত ঈদ উদযাপন কারী হব, এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুধাবনকারী হব। অন্যথায় ছাগল, দুম্বা, উট ইত্যাদি জবাই করে এর মাধ্যমে অধিকাংশ কুরবানীকারী কেবলমাত্র নিজের অর্থ-বিত্ত প্রকাশ করে থাকে। লোকদের ঘরে মাংস প্রেরন করা অথবা কুরবানী করা, পশু জবাই করা, লোকদেরকে দাওয়াত করা-এ কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। এ ছাগল, গরু, দুম্বা, উটের কুরবানীর দ্বারা পশু কুরবানী ছাড়া আর কী কোন উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে? এ কুরবানীর মাধ্যমে কি ইসলামের সেবা হচ্ছে? ইসলামের উন্নতি কল্পে এটি কী কোন ভূমিকা পালন করছে? এ কুরবানীর মাধ্যমে মাংস খাওয়া ছাড়া বা মাংস বন্টন ছাড়া ইসলামের খেদমত করা কি সম্ভব নয়? যদি বলেন এ কুরবানীর উদ্দেশ্য এটিও যে গরীবরা খাবারের জন্য মাংস পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে বছরে একবার গরীবকে মাংস খাইয়ে বাকী সমস্ত বছর তার ক্ষুধা নিবারনের দিকে মনোযোগ না দেয়া কোন্ নেকীর অধিকারী বানিয়ে দেয়? অনেক এমন দেশ আছে যেখানে মাংস দেবার জন্য বা মাংস খাওয়ানোর জন্য কাউকে পাওয়াই যায়না। অথবা এত বেশী কুরবানী করা হয়ে থাকে যা বন্টন করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। হজ্জে গমন কারীদের কুরবানীর মাংস সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যদিও গরিব দেশ গুলোতে এ মাংস নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়ে থাকে কিন্তু এর দ্বারা কতজন গরীবের ক্ষুধা স্থায়ীভাবে নিবারিত হয়? আমি আফ্রিকাতেও থেকেছি। সেখানে গরীবের দুবেলাই রুটির অভাব দেখেছি। পাকিস্তানেও অগনিত দরিদ্র রয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমায়। সুতরাং এ মাংস যা বাহ্যত অনেক বেশী মনে হয় তা জগতের ক্ষুধা নিবারন করতে পারেনা। হাঁ, ঈদের সময় যারা পশু বিক্রয় করে থাকে তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়ে থাকে । আর তারা চড়া দামে তাদের পশু বিক্রি করে থাকে। আর ক্রয় কারীরা সে অর্থ মিটিয়ে থাকে। নিজেদের বিত্ত-বৈভব এবং লোক দেখানোর জন্য লোকেরা এমনটি করে। ঈদের দিন আমরা এই যে বাহ্যিক পশু কুরবানী করে থাকি, আমাদেরকে এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ কারী হওয়া উচিত যে, যে বিপ্লব আনয়নের জন্য পশু কুরবানীর নির্দেশ হয়েছে অথবা যার স্মরণে পশু কুরবানীর নির্দেশ হয়েছে তা কেবল মাত্র হযরত ইসমাইল (আ.) এর জবাই হওয়া থেকে বেঁচে যাওয়া ছিলনা। বরং এর পশ্চাতে এক বিপ্লব আনয়নকারী রুহ কাজ করছিল। শুধু মাত্র হযরত ইসমাইল (আ.) জবাই হওয়া থেকে বেঁচে যাওয়ার স্মরণে খুশি হয়ে আমরা বকরি জবাই করছি অথবা ভেড়া জবাই করছি বা অন্যান্য পশু জবাই করছি, ভাল ভাল খাবার খাচ্ছি এবং ভাল কাপড় পরিধান করারও চেষ্টা করছি, বরং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী আমাদেরকে এর মাধ্যমে বান্দার অধিকার আদায় করার দিকেও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কেননা ইসলামের প্রত্যেক নির্দেশ অগনিত উদ্দেশ্য ধারণ করে থাকে। যখন বলেছেন 'কুরবানী কর' এর সাথে এটাও বলেছেন–এটি তিনটি ভাগে বিভক্ত কর। এর মধ্য থেকে একটি অংশ গরিবদের জন্য এবং একটি অংশ আত্মীয় স্বজনের জন্য রেখে দাও। এ নির্দেশ এ কারনে যে , যেন স্মরণ থাকে যে এটি কেবলই নিজের ব্যক্তিগত অধিকার নয় বরং তোমাদের আত্মীয় স্বজনেরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে। তা আদায় করা প্রয়োজন। গরীবদেরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে , তা আদায় করাও তোমাদের জন্য আবশ্যক। এ অধিকার সাধারণ অবস্থায়ও আদায় করতে হবে। সুখে-দু:খে সকল অবস্থার মাঝে এ অধিকার আদায় করতে হবে। এক জন ধনী ব্যক্তি সচরাচর এ দিকে সাধারণত লক্ষ্য রাখেনা যে, গরীবের অধিকার সংরক্ষন করতে হবে। আমরা খুশির সময় লোক দেখানোর জন্য খরচ করি কিন্তু অধিকার সংরক্ষনের দিকে অধিকাংশের দৃষ্টিই থাকেনা।

এখানে যে বলা হচ্ছে এই যে কুরবানী তোমরা ঐ কুরবানীর স্মরণে করছ যা

> হযরত ইব্রাহীম আর হযরত হাজেরা এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানী সমূহ প্রকৃতপক্ষে সেই কুরবানী কারী মানুষ সৃষ্টি করেছে যে পরিপূর্ণ মানব বলে পরিগনিত হয়েছে। আর প্রত্যেক ধরনের কুরবানীর উচ্চতম মান প্রতিষ্ঠা করে জগত যতদিন থাকবে ততদিনের জন্য নিজের উত্তম নমুনা রেখে গেছেন। **আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।** সুতরাং আজকের ঈদ আমাদেরকে এ মান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে সেই আদর্শের ওপর চলার প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য।

তোমাদের নবীদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) করেছিলেন তা, ঐ সময় প্রকৃত কুরবানী বলে স্বীকৃতি লাভ করবে যখন অন্যদেরও অধিকার সংরক্ষন করবে এবং সমাজের দরিদ্র এবং দূর্বলদের অধিকার আদায় করে দিবে। আর এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন করিমে আল্লাহ তাআলা দরিদ্রদের ক্ষুধার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য কয়েক জায়গায় স্থায়ীভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেভাবে তিনি বলেছেন, **ওয়ালা ইয়াহুজ্জু আলা তাআমিল মিসকিন,** অর্থাৎ যারা আল্লাহ থেকে দূরে চলে যায় তারা গরিব ও মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়ানোর প্রতি অন্যদেরকে উৎসাহিত করেনা, না নিজে খাওয়ায় না অন্যদেরকে উৎসাহিত করে। সুতরাং দরিদ্রের ক্ষুধা নিবারণ করা একটি স্থায়ী নির্দেশ। বছর বছর বড় ঈদে মাংস খাইয়ে দেয়া যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমি যেভাবে বলেছি নবী করিম (সা:) মাংসের একটি অংশ অভাবীদেরকে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এ কারনে যে, তোমাদের উৎসবানান্দ তোমাদেরকে দরিদ্রের অধিকার আদায় থেকে সরিয়ে দূরে যেন না নিয়ে যায়। এ কারনে তোমাদের কুরবানীর তৃতীয় অংশ অভাবীদের জন্য নির্ধারিত। ধনীদের জন্য শর্তসহকারে যাকাত আদায় করতে হয়। আর এর জন্য বিশেষ শর্তে যে অর্থ রয়েছে তা অতি সামান্য।

এমনিভাবে সদকা খয়রাতও আছে যা আমাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ যতটুকু সানন্দে দান করতে পার ততটুকুই কর। কিন্তু ঈদে পশু কুরবানীতে নির্দেশ হলো, যতটুকু তোমাদের অংশ ততটুকুই গরীবের অংশ। আর তাই ক্ষুধা নিবারণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য। নিজ ভাইয়ের খেয়াল রাখা তার অধিকার আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। এ দিকে স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন ধনী ব্যক্তি বা কোন এমন ব্যক্তি যার কুরবানী দেবার সামর্থ্য আছে , (অনেক সময় এক সাধারণ ব্যক্তি যার ওপর যাকাত ফরজ নয় সেও কুরবানী দিয়ে থাকে) তার প্রতিও নির্দেশ যে নিজের তুলনায় স্বল্প আয়ের ব্যক্তি এবং ক্ষুধার্তের প্রতি দৃষ্টি রাখ, যেন কুরবানীর সেই উৎসাহ প্রতিষ্ঠিত হয় যা বান্দার অধিকার সংরক্ষনের ফলে জামা'তের উন্নতির কারণ হয়, জামা'তের দুশ্চিন্তা দূরিভূত হয়। সুতরাং এ কুরবানী সমূহ এবং এ কুরবানীর ঈদ **'রুহামাউ বায়নাহুম'** এর মূল তত্ত্ব যা স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য একটি মাধ্যম স্বরূপ। যে গরিবদেরকে মাংস দিবেন তাদের অবস্থাও জানতে পারবেন। আর তাদের অধিকার সংরক্ষনের প্রতিও মনোযোগ সৃষ্টি হবে। গরীব দেশগুলোতে, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, আফ্রিকার দেশগুলোতে – লোকদেরকে যখন আপনারা মাংস পাঠান তার পূর্বে তাদের অবস্থা আপনাদের জানাই থাকেনা। কিন্তু যোগাযোগ যখন থাকে তখন জানা যায় যে, এ পরিবার তো চব্বিশ ঘন্টা থেকে আটচল্লিশ ঘন্টাই অভূক্ত ছিল। অথবা কয়েক সপ্তাহ ধরে তারা মাংসের চেহারাই দেখেনি। আর মাংস প্রাপ্তির কারনে তাদের ঘরে তারা চুলা জ্বালিয়েছে। ঐ সময় আপনারা যখন এ তোহফা দেন তখন অনেক সময় এমন হয় যে ঘরের লোকেরা বিশ্বাসই করতে পারেনা, তাদের মাঝে এক অদ্ভুত অবস্থা বিরাজ করতে থাকে।

বর্তমান যুগে, সব কিছুর মুল্যমান অতি চড়া। মজদুরি এবং চাকুরি পাওয়া দুষ্কর। নিজ সন্তানদেরকে খাবার খাওয়ানো এক গরীব ব্যক্তির জন্য এখন সমস্যা হয়ে গেছে। এর কারনে পত্রিকায় খবর আসে যে অনেক লোক বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করে ফেলে। সুতরাং এ কুরবানীর দ্বারা একতো এই শিক্ষা হওয়া উচিৎ যে গরীবের অধিকার আদায়ের প্রতি মনোযোগ দাও যেন ক্ষুধা বিমোচন হয়। আর শুধু মাত্র এক বেলা মাংসের ওপর ভরসা করনা যে, গরিবকে সামান্য মাংস পাঠিয়ে দিলাম আর যথেষ্ট হয়ে গেল বরং স্থায়ী ভাবে কুরবানীর ক্ষেত্রে নিজেকে যদি সামান্য ত্যাগ করতেও হয়–তা কর। আর বান্দার স্থায়ী অধিকার সংরক্ষনের প্রতিও দৃষ্টি রাখ। তাকওয়ার সাথে কাজ কর ,আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের এটিই মাধ্যম । অন্যথায় আল্লাহ তাআলার তো এ মাংস এবং এ রক্তের কোন প্রয়োজন নেই। জামাতের নেজামের মাঝে স্থায়ী সাদকাহ এবং সাহায্য সহযোগীতার ব্যবস্থা আছে। এ দিক থেকে আমি তাহরিক করছি দুনিয়ার সকল সম্পদশালী আহমদীদের বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ তাআলার রক্ত আর মাংসের প্রয়োজন নেই, এ রক্ত মাংস কোন বিপ্লব সাধন করতে পারবেনা, যদিনা সঠিক অর্থে আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করা না হয়। যেভাবে আল্লাহ তাআলা কুরআন করিমে স্বয়ং বলেছেন **'লা ইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দেমাউহা ওয়ালাকিঁ ইয়ানালুহুত্তাকওয়া মিন্কুম'**। স্মরণ রাখবে এ কুরবানীর মাংস এবং রক্ত কখনো আল্লাহ তাআলার নিকট পৌঁছায় না কিন্তু তোমাদের হৃদয়ের তাকওয়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায়। আমাদের কুরবানীর পিছনে এ মূল উদ্দেশ্য থাকা উচিৎ।

বান্দার অধিকারেরর একটি দিক আমি বর্ণনা করেছি আর তা হল ক্ষুধা নিবারণ করা। আর আমি যেভাবে বলেছি , জামাতের মাঝে এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রজেক্ট আছে । আল্লাহ তাআলার ফজলে সাহায্য সহযোগীতা করাও হয়। জামা'তের সদস্যদের এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। যদি বান্দার এ অধিকার সংরক্ষণ করা যায় তখন সমষ্টিগত

বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। তখনি বোঝা যাবে যে আমরা এক জামা'তভূক্ত, একে অপরের কষ্ট অনুভবকারী, একে অপরের অধিকার সংরক্ষন কারী।এ ছাড়া কুরবানীর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হল সেই বিপ্লব আনতে হবে যা জগতের চেহারা পাল্টে দেবে অন্যথায় হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.) কে কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করে নিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা বল্লেন–না, পুত্র কুরবানীর বদলে একটি ভেড়া কুরবানী কর। সে কুরবানী দ্বারাও কিছু লাভ হতোনা আর এক ভেড়া কুরবানীর মাধ্যমেও কোন বিপ্লব সাধিত হতোনা। এ ভেড়া কুরবানী তো একটি প্রতীকি প্রকাশ ছিল মাত্র। আর আজ পর্যন্তও ঐ একই ব্যপার অর্থাৎ ঐ কুরবানীকে স্মরণ করো যেন মু'মিন কখনো নিজের উদ্দেশ্যকে ভূলে না যায়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থলে বলেন, হৃদয়ের পবিত্রতাই সত্যিকার কুরবানী। মাংস এবং রক্ত সত্যিকার কুরবানী নয়। যেখানে সাধারণ লোকেরাও পশু কুরবানী করে থাকে সেক্ষেত্রে বিশেষ লোকেরা হৃদয় কুরবানী করে থাকে। কিন্তু খোদা এ বাহ্যিক কুরবানীও বন্ধ করেন নি। যেন বুঝা যায় এ কুরবানীর সাথেও মানুষের সম্পর্ক আছে।

তিনি আরও এক স্থলে বলেন, খোদা তাআলা ইসলামী শরিয়তে অনেক প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং মানুষের জন্য এ নির্দেশ, সে যেন নিজ সকল শক্তি সহকারে আর নিজের সমস্ত দেহ-মনে খোদা তাআলার পথে কুরবান হয়। সুতরাং এ বাহ্যিক কুরবানী সমূহ এ অবস্থার জন্য আদর্শ বলা হয়েছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এই কুরবানীই। এই হল হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর নির্দেশ।

সুতরাং কুরবানীর মূল তত্ত্ব হল যা আমরা আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করব। আর কেবল ব্যক্তিগত ভাবে নয় বরং নিজ ঘরের প্রত্যেক সদস্যকে উক্ত বিষয়টি বুঝাতে হবে এবং অবগত করাতে হবে। এর পর জামাতী ময়দানে প্রত্যেক সদস্যকে এ কুরবানীর ব্যাপারে অবগত হওয়া প্রয়োজন। একটি আদর্শ নিয়ে যখন সেদিকে ধাবমান হব তখনি সকল কুরবানী বিপ্লব সাধনের কারণ হবে। আল্লাহর পথে কুরবান হওয়া কি? তার নির্দেশাবলী পালন করা। নিজের সকল যোগ্যতা এবং শক্তিকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানাতে হবে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্বপ্ন দেখলেন যে, ছেলেকে কুরবানী করছেন, যার আমি উল্লেখ করেছি। আর তিনি ততক্ষন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন যতক্ষন পর্যন্ত ছেলে স্বয়ং সেই কুরবানীর অংশিদার হবার জন্য প্রস্তুত না হন। সে যুগে যদি হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত ইসমাইল (আ.) এর গলায় ছুরি চালিয়ে দিতেন, যখন কিনা সে নিজ পরিপক্কতায় উপনীত হয়নি, আর যদি সে কুরবান হয়েও যেত তবে এমন আহামরি কিছু হতো না। কেননা সে যুগে মানুষ কুরবানী করার রীতির প্রচলন ছিলই । যেভাবে অন্যান্য পিতারা নিজেদের সন্তানদেরকে কুরবানী করে দিত একই ভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সন্তানেরও কুরবানী হয়ে যেত, কেউ জানতেও পারতো না। বরং আজও কিছু কিছু ধর্মে মানুষ কুরবানী করার রীতি প্রচলিত আছে। কেবল খোদা এবং প্রতিমা-র জন্য এ কুরবানী করা হয়না বরং কয়েকটি ধর্মে-গোত্রে মহিলাদেরকে নিজ স্বামীর জন্য কুরবানী করা হয়। যেমন–হিন্দুদের মাঝে এ রীতি আজও কোথাও কোথাও প্রশাসনের অগোচরে এরূপ করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রী-কে তার সাথে 'সহ মরণে' দেয়া হয়। কিন্তু এ কুরবানী সমূহ যা সে সময় করা হতো অথবা আজও আফ্রিকা বা কতক ধর্মের মাঝে মানুষ কুরবানী করার প্রচলন রয়েছে যেভাবে আমি বলেছি, এ কুরবানী সমূহ কোন বিপ্লব আনয়নের কারণ হয় কি? অথবা এ কুরবানীর স্মরণে কি আনন্দ করা হয় ? না, বরং এ কুরবানী সমূহ দ্বারা অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। (কখনই কোথাও প্রশাসন মানুষ কুরবানী করার অনুমতি দেয়না) কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) যে কুরবানী দিয়েছেন তা এক মু'মিনের মাঝে এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে যে, ছেলে পিতার স্বপ্ন শুনে বলে **ইয়া আবাতিফআল মা তু'মার সাতাজেদুনি ইনশাআল্লাহু মিনাস সাবেরিন**। কী সুন্দর উত্তর! আল্লাহ তাআলার সত্তার ওপর পূর্ণ ঈমান এবং তার সত্তার ব্যাপারে অবগত ছেলের উত্তর এমনি ছিল যে, 'হে আমার পিতা, তোমাকে খোদা যে আদেশ দিয়েছে তুমি তাই কর ইনশাআল্লাহ তাআলা আমাকে ধৈর্য ধারন কারী এবং ইমানের ওপর প্রতিষ্ঠিতদের মাঝে পাবে'। এই কুরবানীই ছিল, এ কুরবানী করার উদ্দেশ্য, পিতা ও পুত্রের খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য কোন জবরদস্তি ছাড়া স্বেচ্ছায় কৃত কর্মের বহির্প্রকাশ। হযরত ইব্রাহীম (আ.) যিনি নবীদের পিতা–যাকে নবীদের পিতা বলা হয় তিনি ছেলের কাছে জিজ্ঞেস করে ছেলের বড় হওয়া পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়েছে অথবা যে ধৈর্য ধারন করেছে তা কোন জবরদস্তির বহির্প্রকাশ ছিলনা। বরং তিনি চাইতেন, যে কাজ আমি খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে চাই সেখানে ছেলেও যেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে। তিনি জানতেন, নিশ্চিতই ছেলের উত্তর হাঁ–ই হবে। এটি স্পষ্ট করতে চাচ্ছিলেন যে ছেলেও যেন খোদা তাআলার সত্তা সম্বন্ধে অবগত হয়। ছেলেকে এ পুণ্যে যথেষ্ট অংশিদার বানাতে চাচ্ছিলেন, যা এ কুরবানীর পরিনামে বাবা-ছেলে উভয়েই পাওয়ার ছিল। কিন্তু খোদা তাআলার অভিপ্রায় অন্যকিছু ছিল, এ কুরবানীর, যে স্বপ্ন তাকে দেখানো হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে মানুষ কুরবানীর যে মন্দ রীতি প্রচলিত ছিল,

তাও তিনি বিনাশ করতে চাচ্ছিলেন। যখন পিতা পুত্রকে শুইয়ে দিলেন তখন আল্লাহ তাআলা পিতা পুত্র উভয়ের ওপর ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে বল্লেন, থামো। **"কাদ সাদ্দাকতার রু'য়া।"** নিশ্চয়ই তুমি তোমার স্বপ্ন পূরণ করেছ।

আজ থেকে কোন মানব জীবন উদ্দেশ্য বিহীন পশুর ন্যায় জবাহ করা হবেনা। বরং এ কুরবানীর রীতিকে আজ থেকে আমরা এক নতূন এবং খুব সুন্দর অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিচ্ছি। এ কুরবানীকে বাহ্যিক ভাবে পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ হল, একটি ভেড়া জবাই করে দাও। আর নিজের এ কুরবানীকে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ কুরবানীতে পরিণত কর। যার শুরু, হে ইব্রাহিম', তুমি সে সময় পুরা করে ফেলেছ যখন হাজেরা (আ.)কে পানিশূণ্য মরুভূমিতে রেখে এসেছিলে। খোদা তাআলার নাম বনভূমিতেও যেন বিস্তৃতি লাভ করে। যেন জগত এ সাক্ষ্য দেয় যে, কেবল পিতাই নয় আর কেবল পুত্রই নয় বরং মা-ও এ কুরবানীর মাঝে শামিল। জগৎ যেন এ মোজেজা দেখতে পায় যে আল্লাহ তাআলা বিরান ভূমিকেও শহরে পরিবর্তিত করে দেন। জগৎ যেন এ মোজেজা দেখে যে এ জায়গা-ই যেখানে জঙ্গল আর কারো এটি নিয়ে কোন কৌতুহল নেই তা-ই আল্লাহর সন্তুষ্টিস্থলে পরিণত হতে যাচ্ছে। যেন জগৎ এ অলৌকিকতা দেখতে পায় যে, এ কুরবানীকারীর বংশধরের মাঝে আল্লাহ তাআলা সেই মানুষকে সৃষ্টি করবেন, যিনি জগতকে প্রকৃত কুরবানীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি শিখাবেন। যিনি তার কুরবানীর এমন উপমা সৃষ্টি করবেন যা জগত না ইতিপূর্বে দেখেছে আর না এর পর দেখতে পাবে। এটি উত্তম আদর্শে পরিপূর্ণ এক উপমা। যার ঘুম ও জাগ্রত থাকা, যার মরা-বাঁচা কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলারই জন্য। আর্থিক কুরবানীর উপমা আছে, জীবন কুরবানীর উপমা আছে সময় কুরবানী করার উপমা রয়েছে সম্মান কুরবানীর উপমা রয়েছে।

মালী কুরবানী আছে, যে ঘরে এসে খোদার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, গরীবের ক্ষুধা নিবারনের লক্ষ্যে, অভাবীদের জন্য দ্রুত তা বন্টন করে দেয়া হয়েছে। আর যা ধর্মীয় প্রয়োজনে খরচ, তার তো কোন সীমা পরিসীমা নেই। সদকা খয়রাতের কোন সীমা পরিসীমা নেই। হৃদয় আকর্ষণের কোন সীমা নেই। পশুর পাল দ্বারা পূর্ণ উপত্যকা অন্যকে তোহফা দিয়ে দিয়েছেন, তা-ও আবার এমন ব্যক্তিকে যে মুসলমানও হয়নি। উদ্দেশ্য হল, জগৎ যেন ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে। আর ইসলামের আগমন এবং রসূল করিম (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্যকে যেন উপলব্ধি করে। জীবন আল্লাহর পথে খরচ করার বিষয় রয়েছে, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমূহে তিনি সর্বদা এমন অবস্থানে থাকতেন যা অত্যন্ত বিপদজনক হতো। সাহাবারা বলেন, আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশী সাহসী এবং জীবন কুরবানীকারী তাকেই মনে করা হতো যে যুদ্ধকালে সবচেয়ে বেশী সময় রসূল করীম (সা.) এর পাশে থেকে যুদ্ধ করতো আর নিজ জীবনের কোন পরওয়াই করতো না।

নি:সন্দেহে আল্লাহ তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁকে (সা.) সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন কিন্তু নিজ আমল দ্বারা সাহাবাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে জীবনের কুরবানী দিতে হলে এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে আর এর উদ্দেশ্য এরূপ যে ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য নিজেকে পেশ কর, নিজ জীবনকে এক উত্তম উদ্দেশ্যের লক্ষ্যে কুরবান কর। আর এরই মাধ্যমে চিরস্থায়ী জীবন লাভ হবে। আল্লাহ তাআলার নামকে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিজের জীবনকে তুচ্ছ জিনিস মনে কর। এর পর আছে সময়ের কুরবানী, তা আপনার সকল মুহুর্ত এমনকি ঘুমের মাঝেও খোদার স্মরণে কুরবানী করো। লোকদের অধিকার দিতে তাদের জন্যও সময় দেয়া হয়। কোন এমন সময় নেই যা কোন উদ্দেশ্য ছাড়া অপচয় হয়। এর পর সম্মানের বিষয় রয়েছে। তো **'আল ইজ্জাতু লিল্লাহে জামিয়ান'** এর উত্তম নমুনা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির সামনে নিজের আবেগের এমন উপমা দিয়েছেন যা পূর্বে কখনো ছিল না। জগত আবেগের কুরবানীর উন্নত মান হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় দেখেছে। যখন স্বপ্ন পূরনের লক্ষ্যে রসূল করিম (সা.) সাহাবাদের সাথে মক্কায় আসলেন আর এখানে আসা সত্বেও যখন দেখলেন যে, আজ নিজ আবেগের কুরবানীর মাধ্যমে খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জিত হবে তো এমন শর্তের ওপর সন্ধি

জাগ্রত হোন, আর আজ এ অঙ্গীকার করুন যে ইসলামের বড়ত্ব জগতে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে, রাসূল করিম (সা.) এর সম্মান জগতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, খোদা তাআলার 'তৌহীদ'-এর পতাকাকে জগতে উড্ডয়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক সেই কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবেন যার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ (সা.) এর মসীহকে খোদা তাআলা এ জগতে প্রেরণ করেছেন। ঐ সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ কুরবানীর উদ্দেশ্যে আজ প্রত্যেক আহমদী এক নতুন প্রতিজ্ঞার সাথে নিজেই নিজেকে পেশ করুন যাতে এক খোদার রাজত্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় আর রসূল করিম (সা.) এর পতাকা জগতে উড্ডীন হয়।

করলেন যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দূর্বলতা প্রকাশের নামান্তর ছিল। সাহাবারা চিন্তিত ছিলেন। হযরত ওমরের ন্যায় দৃঢ় ইমানদার ব্যক্তিও জোশের কারনে রসূল করিম (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনি কি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সত্যিকার রসুল নন?' সাহাবাদের কণ্ঠ সেদিন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল, সাহাবারা জীবনের কুরবানী দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নিজেদের সম্মান এবং আবেগের কুরবানী দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু সেই রসূল (সা.), সেই পরিপূর্ণ রসূল (সা.) স্বকর্মে উদ্দীপিত এবং সম্মানিত রসুল (সা.), যার ওঠা চলা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছিল। আর তাঁরই (আল্লাহ্‌র) উদ্দেশ্যে সকল কুরবানী করার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি জানতেন নিশ্চিত আমি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় এবং সত্য রসুল । কিন্তু এ সন্ধি যা বাহ্যত লাঞ্ছনার কারণ মনে হচ্ছিল, আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় অনুযায়ী স্পষ্ট বিজয়ের ঘোষণা দিচ্ছে। এরপর তিনি নিজের পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে যা বাহ্যিক ভাবে এ আবেগের কুরবানীর বহির্প্রকাশের জন্য এটি প্রয়োজন ছিল, তারও উত্তম নমুনা তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ।

সাহাবাদেরকে এ কুরবানীতে শামিল করে নিলেন, যারা কুরবানী করার জন্য পূর্বে প্রস্তুত ছিলনা। আর তারাও তাঁর (সা.) কুরবানী করার পর এ মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ কুরবানীর মর্যাদা উপলব্ধি করে নিজেদের আবেগ কুরবানী কারীতে পরিণত হলেন। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম আর হযরত হাজেরা এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানী সমূহ প্রকৃতপক্ষে সেই কুরবানী কারী মানুষ সৃষ্টি করেছে, যিনি পরিপূর্ণ মানব বলে পরিগণিত হয়েছেন। আর প্রত্যেক ধরনের কুরবানীর উচ্চতম মান প্রতিষ্ঠা করে জগত যতদিন থাকবে ততদিনের জন্য নিজের উত্তম নমুনা রেখে গেছেন। **আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।**

সুতরাং আজকের ঈদ আমাদেরকে এ মান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে সেই আদর্শের ওপর চলার প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য। তা স্মরণ করার লক্ষ্যে (আজকের এ ঈদ)। আল্লাহর অধিকার এবং বান্দার অধিকার আদায়ের উন্নত মান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে (আজকের এ ঈদ)। আমাদেরকে আমাদের অঙ্গীকারের স্মরণ করানোর লক্ষ্যে আজকের এ ঈদ যে, আমরা আমাদের জীবন সম্পদ এবং সময় কুরবানীর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকব। সেই রাসূল (সা.) যিনি সকল প্রকারের কুরবানী করেছেন, উত্তম নমুনা প্রতিষ্ঠা করেছেন যেন মানব নিজ জন্মলাভের উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে পারে। সেই রাসুলে করিম (সা.) এর সত্যিকার প্রেমিক আর সত্যিকার গোলামের জামা'তের সদস্য বলে আমরা দাবি করি। সুতরাং জাগ্রত হোন, আর আজ এ অঙ্গীকার করুন যে ইসলামের বড়ত্ব জগতে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে, রাসূল করিম (সা.) এর সম্মান জগতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, খোদা তাআলার 'তৌহীদ'-এর পতাকাকে জগতে উড্ডয়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক সেই কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবেন যার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ (সা.) এর মসীহকে খোদা তাআলা এ জগতে প্রেরণ করেছেন। ঐ সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ কুরবানীর উদ্দেশ্যে আজ প্রত্যেক আহমদী এক নতুন প্রতিজ্ঞার সাথে নিজেই নিজেকে পেশ করুন যাতে এক খোদার রাজত্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় আর রাসূল করিম (সা.) এর পতাকা জগতে উড্ডীন হয়।

আল্লাহ তাআলার ফজলে জামাতে আহমদীয়া নিজেদের প্রায় একশত বিশ বছরের ইতিহাসে নিজেদের উদ্দেশ্যপূর্ণ কুরবানী সমূহকে যা জীবন দানের মাধ্যমেও, সম্পদ প্রদানের মাধ্যমেও সময় উৎসর্গ করার মাধ্যমেও এবং সম্মান ও আবেগের কুরবানীর মাধ্যমে (পরিপূর্ণ), তা কখনো কমে যেতে দেয়নি। আজও অঙ্গীকার করুন যে এ কুরবানী সমূহের অগ্নিশিখা কখনো আমাদের হৃদয়ে নির্বাপিত হতে দিবনা আর আমাদের বংশধরদের হৃদয়েও নির্বাপিত হতে দেবনা। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনই সর্বদা আমাদের উদ্দেশ্য হবে, আর তার সামনে বিনয়াবনত হয়ে তার নিকট সাহায্য যাচনা করে আমরা আমাদের আকা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শকে সর্বদা নিজেদের সামনে রাখব।

বিগত দিনগুলোতে, কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে আমি এখান থেকে যাত্রা করেছিলাম তখনও আমি ভারতের উদ্দেশ্যে সফরেই ছিলাম যা দক্ষিন ভারতের সফর ছিল যা দু সপ্তাহের জন্য ছিল, আল্লাহ তাআলার ফজলে তা খুব সফলতার সাথে

আপনারা যারা আমার সামনে বসে আছেন আপনাদের সকলকে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। আর বিশ্বের সকল আহমদীকে ঈদ মোবারক এবং ভালবাসা পূর্ণ সালাম জানাচ্ছি। যারা নিরাপত্তার মাঝে আছেন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে সর্বদা নিরাপত্তার মাঝে রাখুন। শান্তির অবস্থায় আপনারা সর্বদা নিজেদের কুরবানীর মান পরীক্ষা করতে থাকুন। আর নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করার চেষ্টা করতে থাকুন যেন আমাদের জীবদ্দশাতেই আমরা স্পষ্ট বিজয়ের দৃশ্য অবলোকন করতে পারি।

শেষ হয়েছিল। কিন্তু কাদিয়ান পৌঁছানোর পূর্বেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হল, যে দিল্লি থেকে ফেরত আসতে হল আর আমাকে অনেক বড় কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হল, কিন্তু জামাতের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে আর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এর মাঝে মনে করে আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর পর কয়েক ব্যক্তি আমার কাছে লিখেছে, প্রত্যেক আহমদী নিজের মত উত্তর দিয়েছে কিন্তু এক দিক থেকে অনেকের মতে এটি হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ বিষয় । যাই হোক আমি একথা বলিনা, কেননা আমার মর্যাদা এতটা নয় আর আমরা এটা বলতেও পারিনা যে এ ঘটনা ঐ ঘটনার অনুরূপ। যেভাবে আমি বলেছি প্রত্যেকের নিজ নিজ অভিরুচি রয়েছে আর সে অনুযায়ী লোকেরা উপমা অনুসন্ধান করতে থাকে, এমন কি আহমদীরাও।

দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তাআলা এর পরিনাম সফলতা স্বরূপ নিরূপন করেন। কেননা এখানে সামাঞ্জস্যতার কথা। যখন একটি সুযোগে লোক সামাঞ্জস্য করে তখন এটাও মনে করা হয় যে এর পরিনামও অনুরূপ হবে। অথবা সে সময় এ পরিনাম প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক। আর দুর্বল ইমানের লোক এর মাধ্যমে ধাক্কা খেতে পারে পরিনাম ইনশাল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা দেখাবেন আর ভালই হবে কেননা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাথে আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার রয়েছে। কিন্তু তিনিই ভাল জানেন যে কবে এ পরিণাম তিনি দেখাবেন। সুতরাং যদি কোন সাদৃশ্য থেকেই থাকে তাহলে এ সাদৃশ্যের পরিনামের জন্য আমাদের দোয়া করা প্রয়োজন। সে যাই হোক, তবে এটা নিশ্চিত যে, আবেগের কুরবানী কাদিয়ানের আহমদীরা এবং পাকিস্তানের ঐ সকল আহমদীরা দিয়েছে যারা ভিসা নিয়েছিল এবং তাদের জলসায় আসা এবং আমার সাথে সাক্ষাত করার সবিশেষ আগ্রহ ছিল। তারা নিশ্চিত সম্মানের যোগ্য।

কিন্তু এর সাথে সাথে আমি এটাও বলতে চাই যে , হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যা আমি প্রথমেই ইশারা করে দিয়েছি, সাহাবারা যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন তা আমরা এক দিক থেকে নিশ্চিত অনুরূপ বলতে পারি। এ আবেগের কুরবানী আর কতক লোকের ধারণায় এ সম্মানের কুরবানীর কারণে ঐ সাহাবীদের যে দোয়ার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছিল সেই অবস্থা নিজেদের ওপর স্বেচ্ছায় আরোপ করে নিন। নিজেদের কামনা যাচনা এবং কান্না কাটি সেই প্রচন্ডতার সাথে খোদা তাআলার দরবারে পেশ করুন যেন খোদা তাআলা আমাদের এ তুচ্ছ কুরবানীকে আর আমাদের বিগলিত দোয়া সমূহকে কবুল করে প্রত্যেক বিরোধী এবং শত্রুর মন্দ বিষয়গুলো তাদেরই দিকে ফেরত পাঠান। আর আমাদের জন্য এমন উপকরণ সৃষ্টি করে দিন যেন পথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আর বিরোধীদের সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা আর ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র যেন খড় কুটার ন্যায় উড়ে যায়। পাকিস্তানে ভারতে আমাদের জলসা হোক, আমাদের উজ্জলতা বৃদ্ধি পাক আর আল্লাহ তাআলার ফজলের বৃষ্টি পূর্বের তুলনায় আরও অধিক পরিমাণে যেন বর্ষিত হয়। হে আমাদের খোদা আমরা দুর্বল, এবং গুনাহগার আমাদের ওপর সর্বদা নিজের ফজল এবং রহমত বর্ষণ কর। আমাদের এ তুচ্ছ কুরবানীকে তুমি কবুল কর আর আমাদেরকে সর্বদা তোমার কল্যানে ভূষিত করতে থাক। আর এছাড়াও ঈদের কারনে কাদিয়ানের আহমদীরা খুবই আগ্রহভরে অপেক্ষমান ছিল আর পূর্বের প্রোগ্রাম অনুযায়ী ঈদ সেখানে পড়ার কথা ছিল আমি তাদের সকলকে ঈদ মোবারক এবং ভালবাসা পূর্ণ সালাম দিচ্ছি। তাদের অনেকের অনেক চিঠি পত্র আসছে। ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাআলা অতি শিঘ্র নিজ ফজল বর্ষণ করবেন। রাবওয়া এবং পাকিস্তানের আহমদী যারা আছেন তাদেরকেও আমি ভালবাসায় পরিপূর্ণ সালাম দিচ্ছি আপনাদের ব্যথা আমি বুঝি এবং অনুভব করি আপনারা যে অবস্থার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করছেন এমন অবস্থার মাঝে আমিও যখন পাকিস্তানে ছিলাম অতিক্রম করেছি আর আজ তা ছাপিয়ে অন্য এক কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছি।

পাকিস্তানের আহমদী তারা, যারা সকল প্রকারের কুরবানীর মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং তা লাগাতার করেছেন এবং করেই যাচ্ছেন। যেভাবে কাদিয়ানের দরবেশরা এক দীর্ঘ সময় এ কুরবানী পেশ করেছেন এবং কুরবানীর উত্তম মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর আজও তারা করে চলেছেন। এ কুরবানী সমূহের গ্রহণীয়তায় পৌঁছানোর একটাই মাধ্যম আর তা হল আল্লাহ তাআলার সামনে বিনয়াবনত থাকুন। আল্লাহ তাআলা সকলকে এর সৌভাগ্য দান করুন। আপনারা যারা আমার সামনে বসে আছেন আপনাদের সকলকে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। আর বিশ্বের সকল আহমদীকে ঈদ মোবারক এবং ভালবাসা পূর্ণ সালাম জানাচ্ছি। যারা নিরাপত্তার মাঝে আছেন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে সর্বদা নিরাপত্তার মাঝে রাখুন। শান্তির অবস্থায় আপনারা সর্বদা নিজেদের কুরবানীর মান পরীক্ষা করতে থাকুন। আর নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করার চেষ্টা করতে থাকুন যেন আমাদের জীবদ্দশাতেই আমরা স্পষ্ট বিজয়ের দৃশ্য অবলোকন করতে পারি। এর পর দোয়া হবে। দোয়ার মাঝে জামা'তের ওয়াকেফে জীন্দেগী জামা'তের সকল কার্যনির্বাহীগণ, খিদমত কারীগণ, ওয়াকেফে নও, মালী কুরবানী কারী এবং যেকোন ধরনের কুরবানী কারী সকলকে এবং সমস্ত জামা'তকে দোয়াতে স্মরণ করবেন , আল্লাহ তাআলা সকলের ওপর নিজের ফজল বর্ষণ করুন। (আমীন)।

অনুবাদ: **শেখ মোস্তাফিজুর রহমান।**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

পবিত্র কুরআন শিক্ষার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ

রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত তালীমুল কুরআন ক্লাস উপলক্ষে

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ঈমান উদ্দীপক বাণী

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থ কুরআন শরীফ দান করেছেন। এবং এর তেলাওয়াতকারী ও এর শিক্ষার ওপর আমলকারীদের জন্য উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ কল্যাণরাজি অর্জনের সুসংবাদ দিয়েছেন।

আঁ হযরত (সা.) কুরআন করীম তেলাওয়াতকারীদের ঈর্ষনীয় দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তিনি (সা.) বলেছেন–"দু'ধরনের মানুষ ঈর্ষণীয়, প্রথমত ঐ ব্যক্তি যাকে খোদা তাআলা কুরআন করীম শিখিয়েছেন এবং সে দিন রাত এটিকে এত বেশি তেলাওয়াত করে যে, তার প্রতিবেশীরাও এতে প্রভাবিত হয়ে বলে–'হায়! যদি আমিও এভাবে কুরআন পড়তে জানতাম আর তার মত এভাবে কুরআন পড়তে পারতাম'। হুযূর আকরাম (সা.) আরও বলেন–"যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং এর ওপর আমল করে, কিয়ামতের দিন তার মা-বাবাকে এমন মুকুট পরানো হবে, যার উজ্জ্বলতা সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি হবে।"

"কুরআন পড়, কেননা কিয়ামতের দিন এটি এর তেলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশ করবে।" কুরআন আধ্যাত্মিক মণি-মানিক্যের সেই ভান্ডার যার মধ্যে অপরিসীম জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের (মারেফতের) গুপ্ত থেকে গুপ্ততর সম্পদ লুক্কায়িত আছে। পৃথিবীতে জ্ঞানের এমন কোন বিষয় নেই, যার মূল কুরআনে নেই। কুরআন জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার ওপর আলোকপাত করে। আর জগতে এমন কোন প্রশ্ন নেই, যার উত্তর কুরআনে নেই। কুরআন পূর্বের সকল গ্রন্থসমূহের সারবস্তু।

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন : "কুরআন পড়, কেননা কিয়ামতের দিন এটি এর তেলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশ করবে।" কুরআন আধ্যাত্মিক মণি-মানিক্যের সেই ভান্ডার যার মধ্যে অপরিসীম জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের (মারেফতের) গুপ্ত থেকে গুপ্ততর সম্পদ লুক্কায়িত আছে। পৃথিবীতে জ্ঞানের এমন কোন বিষয় নেই, যার মূল কুরআনে নেই। কুরআন জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার ওপর আলোকপাত করে। আর জগতে এমন কোন প্রশ্ন নেই, যার উত্তর কুরআনে নেই। কুরআন পূর্বের সকল গ্রন্থসমূহের সারবস্তু।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–"কুরআন শরীফ নিয়ে চিন্তা কর, এতে সব আছে। পাপ-পুণ্যের বর্ণনা হোক অথবা ভবিষ্যতের সংবাদাদি–সবই আছে। ভালভাবে জেনে নাও, এটি সেই ধর্ম উপস্থাপন করে, যার ওপর কোন আপত্তি আসতে পারে না, কারণ এর কল্যাণরাজি ও ফলরাজি সর্বদাই তরতাজা পাওয়া যায়।.........এই মর্যাদা কেবল কুরআন মজীদেরই রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় রোগের চিকিৎসা এতে বর্ণনা করেছেন এবং পূর্ণ শক্তি অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন এবং ইতোমধ্যে যেসব মন্দ প্রকাশ পেয়ে গেছে, তা দূর করার পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। তাই কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে থাকো এবং নিজের চালচলনকে এর নির্দেশানুযায়ী পরিচালনায় সচেষ্ট হও।"

মোট কথা কুরআন করীম এক অত্যন্ত বরকতপূর্ণ কিতাব ও খোদা প্রদত্ত এক মহা নিয়ামত। এর সম্মান যতই করা হোক না কেন, তা সামান্যই হবে। এটি এমন অমূল্য পদ্মরাগ-মণি যার মূল্যের কোন ধারণাই করা যায় না, এ এমন এক নূর যা কখনো ম্লান হবে না। এর কল্যাণধারা সদা বহমান। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–"সুতরাং সতর্ক হও! এবং খোদাপ্রদত্ত শিক্ষা ও কুরআন প্রদর্শিত পথের বিপরীতে এক পা-ও এগিয়ো না। আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি, যে ব্যক্তি কুরআনের সাতশ' নির্দেশ থেকে একটি ছোট নির্দেশও

অমান্য করে, সে নিজ হাতে নিজের পরিত্রাণের দরজা বন্ধ করে দেয়। সত্য ও পরিপূর্ণ পরিত্রাণের পথ কুরআনই খুলে দিয়েছে, বাকি সব ছিল এর প্রতিবিম্ব মাত্র। সুতরাং তোমরা পূর্ণ মনোযোগের সাথে একে পড় এবং একে গভীরভাবে ভালবাস, এমন ভালবাসা যা আর কোন কিছুর সাথে হয় না। কেননা খোদা তাআলা যেভাবে আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন–**'আল্ খায়রু কুল্লুহু ফিল কুরআন'** অর্থাৎ সর্বপ্রকার মঙ্গল পবিত্র কুরআনে নিহিত; এটিই সত্য কথা। পরিতাপ তাদের জন্য, যারা অন্য কোন বস্তুকে এর ওপর মর্যাদা দেয়। তোমাদের সকল কল্যাণ ও পরিত্রাণের উৎস কুরআনের মাঝেই নিহিত। তোমাদের এমন কোন ধর্মীয় চাহিদা নেই, যা কুরআনের মাধ্যমে পূরণ হয় না। কিয়ামতের দিন তোমাদের ঈমানের সত্যাসত্য নিরূপণকারী হবে কুরআন এবং কুরআন ব্যতীত আকাশের নীচে এমন কোন গ্রন্থ নেই, যা এর সাহায্য ছাড়াই তোমাদের হেদায়াত দিতে পারে। খোদা তাআলা তোমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, কুরআনের মত গ্রন্থ তোমাদের দান করেছেন। আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি, যে গ্রন্থ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা যদি খৃষ্টানদের দেয়া হতো, তাহলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোত না। আর এই নিয়ামত ও হেদায়েত যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা যদি ইহুদীদেরকে তওরাতের পরিবর্তে দেয়া হোত, তাহলে তাদের কিছু কিছু ফেরকা কিয়ামতের অস্বীকারকারী হতো না। সুতরাং এই পুরস্কারের মর্যাদা দাও যা তোমাদের দেয়া হয়েছে। এ নিতান্তই মূল্যবান পুরস্কার। এটি খুব বড় সম্পদ। যদি কুরআন না আসতো, তবে পৃথিবী এক নোংরা মাংসপিণ্ডের ন্যায় হোত। কুরআন সেই গ্রন্থ, যার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অপরাপর সকল কিছুই তুচ্ছ।"

সুতরাং আমাদের উচিত যেন এই নূর থেকে নিজেও আলোকিত হই এবং নিজের ঘরকেও আলোকিত করি....। আজ আমাদেরই দায়িত্ব নিজ কর্মের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই শিক্ষার আলোয় সারা পৃথিবীকে আলোকিত করা। নিজেদের ঘরকে এই পবিত্র কিতাবের তেলাওয়াত দ্বারা সুসজ্জিত করতে হবে। তাই নিজেদের ঘরে প্রতিদিন মহান এই কিতাবের তেলাওয়াত প্রচলন করুন। আল্লাহ্ আপনাদের সকলের সাথী হোন এবং আপনাদেরকে এই তালীমুল কুরআন ক্লাস থেকে পুরোপুরি লাভবান করে কুরআন করীমের আলোয় সমৃদ্ধ ও কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং আপনাদের নিজেদের জীবন এর শিক্ষানুসারে পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(সূত্র : দৈনিক আল ফযল, ২১ জুলাই ২০০৭)

এ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন–

এখন আসমানের নীচে মাত্র একজনই নবী আছেন, এবং মাত্র একটিই কিতাব আছে, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- যিনি সকল নবীগণের চাইতে উন্নীত এবং উত্তম এবং সকল রসূলগণের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর এবং যিনি নবীগণের মোহর, মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, যাঁর আনুগত্য করলে খোদা তাআলাকে পাওয়া যায় এবং অন্ধকারের সব আবরণ খসে পড়ে: এবং এই জগতেই প্রকৃত পরিত্রাণ বা নাজাতের চিহ্ন ও প্রভাব প্রকাশিত হয়। এবং কুরআন শরীফ যার মধ্যে প্রকৃত ও পূর্ণ হেদায়াত নিহিত রয়েছে, তার মাধ্যমে হাক্কানী ইলম ও মারেফাত বা প্রকৃত জ্ঞান এবং খোদার উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ও পরিচয় লাভ করা যায় এবং হৃদয় মানবীয় দূর্বলতা সমূহ থেকে মুক্ত হয়, এবং মানুষ অজ্ঞতা ও অলসতা ও সন্দেহ-সংশয়ের আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং হাক্কুল ইয়াকীন বা সত্য ও দৃঢ়বিশ্বাসের স্তরে বা মোকামে পৌঁছে যায়।

–(বারাহীনে আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ৫৩৫, পাদটীকা)

হে পৃথিবীর সকল অধিবাসীবৃন্দ! হে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সকল মানবাত্মাবৃন্দ! আমি সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে তোমাদের সামনে এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, এখন পৃথিবীর বুকে একমাত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, এবং সত্য খোদাও সেই খোদা যার বর্ণনা দিয়েছে কুরআন : এবং চিরন্তন আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী এবং গৌরব ও পবিত্রতার সিংহাসনের সমাসীন নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাঁর আধ্যাত্মিক জিন্দেগী ও পবিত্র গৌরবের এই প্রমাণ আমি পেয়েছি যে, তাঁর আনুগত্য ও ভালবাসায় আমরা রুহুল কুদ্দুসকে পেয়ে থাকি এবং খোদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি এবং ঐশী নিদর্শন দেখার সৌভাগ্য লাভ করি।

(তিরইয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা-১১)

ইসলাম
প্রচার-প্রসার ও বিস্তারে আহমদীয়াত

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব
মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন

ইসলামের পূণর্জাগরণ ও পূণর্বিজয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আবির্ভূত শেষ যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বীয় জীবনে ইসলাম প্রচারে অহরাত্র নিয়োজিত ছিলেন। তিনি (আ.) বলেন, আমার জীবনকালের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে যে কেউ জানতে পাবে যে, ইসলামের শ্বাশ্বত বাণী প্রচারে আমি আমার দৃঢ় ঈমানের শক্তিতে উজ্জীবিত। বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা, সুধী মহল, রাষ্ট্রনায়কদের কাছে রেজিষ্ট্রি ডাক যোগে আমি বার হাজার পুস্তক-পুস্তিকা প্রেরণ করেছি। এমন কী আমি প্রিন্স অব ওয়েলস এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মি. গ্লেড স্টোনের কাছেও পুস্তকাদি প্রেরণ করেছি। তাছাড়া যুবরাজ বিসমার্ক এর কাছেও আমি চিঠি পত্র ও পুস্তকাদি পাঠিয়েছি আরও পাঠিয়েছি বিশ্বের অন্যান্য নেতৃবর্গকেও। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, আমি অন্যান্য ধর্মীয় নেতা বিশেষত খৃষ্টধর্মাবলম্বী নেতাদের নামে বার হাজারেরও অধিক চিঠি ও প্রচার পত্র প্রেরণ করেছি। ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের প্রখ্যাত এমন কোন পাদ্রী নেই যাকে রেজিষ্ট্রি ডাক যোগে এ প্রচারপত্র প্রেরণ করা হয়নি। (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৪৭, আল ফযল ২৮ বর্ষ, ডিসেম্বর ২০০১, পৃ: ৩৩)

আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বলেছেন, তুমি বিজয়ী বেশে অগ্রসর হবে এবং চূড়ান্ত বিজয় তোমারই হবে এবং আমি তোমার ওপর থেকে সেই সব বোঝা অপসারণ করব যেগুলো তোমাকে ভারাক্রান্ত করেছে। খোদা তাআলার অভিপ্রায় এই যে, তিনি তোমার একত্ব, তোমার মাহাত্ম এবং তোমার পূর্ণতাকে বিস্তৃতি দান করবেন। খোদা তাআলা তোমার স্বরূপ প্রকাশিত করবেন এবং তোমাকে দীর্ঘায়ু দান করবেন। পৃথিবীতে এক সতর্ককারী এসেছে, কিন্তু পৃথিবীবাসী তাঁকে গ্রহণ করেনি। খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং মহা শক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন।...... এবং তাঁর জন্য ভাণ্ডারসমূহ উন্মুক্ত করা হবে।........এসব খোদা তাআলার কল্যাণরাজি আর তোমার দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যজনক।

আমরা শীঘ্রই তোমাকে তোমার অনুসারীদেরকে এবং তোমার চতুস্পার্শ্বে যারা আছে তাদের নিদর্শন দেখাবো। প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিজয় সুস্পষ্ট হবে। তারা কী বলে! ‘তোমরা একটি বড় দল’? তারা সকলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। লোকেরা তোমাকে পরিত্যাগ করলেও আমি তোমার সাথে থাকব। আর লোকেরা যদি তোমাকে নিরাপদ না করে তবে আমি তোমাকে সুরক্ষা দান করব। আমি স্বীয় আলোকমালা এবং পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা তোমাকে উচ্চকিত করব। হে ইবরাহীম! তোমার প্রতি সালাম (শান্তি) আমি তোমাকে নিখাঁদ বন্ধুরূপে নির্বাচিত করেছি। খোদা তোমার সমস্ত কার্যক্রমকে সুবিন্যস্ত করে দিবেন এবং তোমার সমস্ত মনবাসনা পূর্ণ করবেন। তুমি আমার জন্য আমার একত্ব এবং একত্বের প্রকাশকারী। খোদা তাআলা এমন নন যে তোমাকে পরিত্যাগ করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক করেন। তিনি তোমার অবস্থানকে উন্নীত করবেন আর তোমার বংশকে বিস্তৃতি দান করবেন। এবং তোমার পরে তোমার বংশধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আমি তোমাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠিত করব এবং তোমাকে সম্মানিত করব আর মানুষের হৃদয়ে তোমার জন্য ভালবাসা গেঁথে দিব। (ইযালায়ে আওহাম, ৬৩২-৬৩৫ রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, ৪৪১-৪৪৩ পৃষ্ঠা, তাযকেরা ১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে দেয়া মহান আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি এমনভাবে পূর্ণতা পেয়েছে, বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বিজয় ঝাণ্ডা বয়ে নিয়ে চলছে। এখন এই জামা’তের বরকতমণ্ডিত পঞ্চম খিলাফতকালে বিশ্বের প্রতিটি মহাদেশে আর দ্বীপ দেশগুলোতে আহমদীয়াত তথা ইসলামের বিজয় পতাকা প্রতিষ্ঠা পেয়ে আরও সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে।

আমরা এখানে বিশ্বের বড় বড় কয়েকটি দেশে আহমদীয়াতের সূচনা এবং তা বিস্তার লাভের সংক্ষিপ্ত এক চিত্র তুলে ধরছি।

যুক্তরাজ্য :

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়াকে পত্র মারফত ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

ইংল্যান্ড থেকে ১৮৯২ সালের ১৩ জানুয়ারী Mr. John Wait কাদিয়ানে এসে হুযূর (আ.)-এর কাছে বয়আত নিয়ে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করেন। এর উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন, ... আমি এক কাশফে (দিব্যদর্শনে) দেখলাম, লণ্ডন শহরে এক বক্তৃতা-মঞ্চে আমি দাঁড়িয়ে আছি আর ইংরেজী ভাষায় ইসলামের সত্যতা প্রতিপন্ন করে বক্তব্য রাখছি। তারপর আমি ছোট ছোট বৃক্ষে অবস্থানরত কিছু পাখি ধরলাম। এগুলো ছিল সাদা বর্ণের আর দেখতে তিতির পাখির মত। আমি এ দিব্যদর্শনের তাবির (ব্যাখ্যা) এই করলাম যে, এটা আমার 'শুভবার্তা', আমার লিখনির মাধ্যমে সেখানে (যুক্তরাজ্যে) ছড়িয়ে পরবে এবং স্বচ্ছ হৃদয়-সম্পন্ন বহু ব্যক্তিবর্গ ইসলামে দীক্ষা নেবে। *(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৭)*

মি. ওয়েটের ইসলাম গ্রহণ সেই দিব্যদর্শনের পূর্ণতার অংশবিশেষ। আরও একজন ইংরেজ Prof. Clement Regg হুযূর (আ.)-এর সাথে ১২ মে ১৯০৮ সাক্ষাৎ করে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। হুযূর (আ.)-এর তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ মাধুর্যময় এবং সন্তোষজনক পরিপূর্ণ জবাব শুনে তিনি (প্রফে. ক্লিমেন্ট) বলেন, '....আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। এমন প্রশান্তি কেবল আল্লাহ্ তাআলার নবীই দিতে পারেন।' *(বদর, ২৬ মে, ১৯০৮, পৃষ্ঠা-৫)*

পরবর্তীতে তিনিও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রা.) মোকাররম খাজা কামালউদ্দিন সাহেবের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ধর্মের সেবায় স্বীয় জীবন উৎসর্গকারী হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়াল সাহেব (রা.)কে ২৮ জুন ১৯১৩ সালে সমাগত সত্য প্রচারের জন্য ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ওয়েম্বলী কনফারেন্সে যোগদানের জন্য ২২ আগষ্ট ১৯২৪ সালে লন্ডনে পৌঁছান। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ সালে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব তাঁর সন্দর্ভ ইংরেজীতে পাঠ করে শোনান। তিনি (রা.) স্বীয় পবিত্র হস্তে ১৯ অক্টোবর ১৯২৪ সালে **'মসজিদ ফযল'** লন্ডনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

একবার হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এক বাসনার কথা এভাবে উল্লেখ করেন, "ইউরোপীয়দের মধ্য থেকে যদি কেউ এই সিলসিলার সেবার জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করতেন.....কিন্তু এরকম ব্যক্তির জন্য এটা আবশ্যক যে, সে যেন কিছু সময় আমাদের সংস্পর্শে থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত মৌলিক বিষয়াদি শিখে নেয়।" *(তারীখে আহমদীয়াত, ১০ম খন্ড, ৫৭১ পৃষ্ঠা)*

ইংল্যাণ্ডের মি. জন ব্রায়ান অরচার্ড ১৯৪৬ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর নাম বশির আহমদ অরচার্ড রাখেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অভিপ্রায় অনুযায়ী ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের মধ্য থেকে তিনি স্বীয় জীবন ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং ইউরোপীয় মোবাল্লেগ হবার বিরল সম্মান লাভ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সময় লন্ডনে ২ থেকে ৪ জুন ১৯৭৮ সালে **"কাসরে সলীব"** কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। যাতে হুযূর (রাহে.) বক্তব্য রাখেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) রাবওয়া থেকে হিযরত করে ২৯ এপ্রিল লন্ডনে চলে আসেন। হুযূর (রাহে.) লন্ডন আগমনের পর সেখানে **"রাক্বীম প্রেস"** প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যায় ধর্মীয় তত্ত্ব-জ্ঞানপূর্ণ পুস্তকাদি প্রকাশিত হচ্ছে।

পাকিস্তানে আহমদীয়াতের যে কণ্ঠকে আইনী প্রক্রিয়ায় রুদ্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, তা **বায়তুল ফযল** লন্ডন হতে উচ্চারিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। এপ্রিল ১৯৯২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ঈদের খুৎবা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইউরোপে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। এবং ৭ জানুয়ারী ১৯৯৪ সালে জুমুআর খুৎবার মাধ্যমে MTA এর প্রাত্যাহিক সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়... যা জানুয়ারী ১৯৯৬ সাল থেকে অহরাত্র প্রচারিত হচ্ছে। লন্ডন থেকে আনুমানিক ৩০ মাইল দুরে টিলফোর্ডে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ সালে একটি বৃহদায়তনের জায়গা ক্রয় করে জামা'ত **"ইসলামাবাদ"** নামকরণ করে কেন্দ্র স্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করে।

পঞ্চম খলীফার যুগে ২০০৬ সালে **অনটনের** কাছে প্রায় ১২০০ একরের একটি জায়গা **"হাদীকাতুল মাহদী"** ক্রয় করা হয়।

২২ এপ্রিল ২০০৩ সালে লন্ডনের মসজিদ ফযলে ৫ম খলীফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর এতে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) পঞ্চম খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর খিলাফত কালে মসজিদ **বায়তুল ফুতুহ** লন্ডন-এর উদ্বোধন হয়। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য MTA -এর আরো দু'টি চ্যানেলের যাত্রা শুরু হয়েছে। ফলে MTA-এর এখন ৩টি চ্যানেল। MTA-3 এর অনুষ্ঠানমালা পুরো সময় জুড়ে আরবী ভাষায় প্রচারিত হচ্ছে।

জার্মানী :

জার্মানীর বিখ্যাত শহর মিউনিখের জার্মান বংশোদ্ভুত এক ভদ্র মহিলা Mrs. Cereolaman বাস করতেন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ লাভ করেন। হুযূর (আ.)-এর কাছে লেখা তার আন্তরিকতাপূর্ণ এক চিঠিতে তিনি হুযূর (আ.)-এর ছবি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মৌলভী মোবারক আলী সাহেব বাঙালি এবং মালেক গোলাম ফরিদ সাহেবকে বার্লিনে পাঠান। তাঁদের প্রচেষ্টায় ১৯২৩ ঈসাব্দের ডিসেম্বর মাসে জার্মানীতে ইউরোপের দ্বিতীয় মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যা উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ১৯২৪ সালে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০ জানুয়ারী ১৯৪৯ মোকাররম চৌধুরী আব্দুল লতিফ সাহেবের মাধ্যমে তা পুণরায় চালু হয়। ১৯৫৪ ঈসাব্দে কুরআন করীমের জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ২৫-২৯ জুন ১৯৫৫ কয়েক দিনের এক সফরে এই দেশে আসেন। হামবুর্গ নগর মিলনায়তনে জার্মানীদের উদ্দেশ্যে হুযূর (রা.) বলেন "ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির আর বিশ্বের সকলের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সার্বজনীন শিক্ষা দেয়। এজন্য ইসলামই আপনাদের জন্য একমাত্র আদর্শ। আর বিশেষ করে সহিষ্ণু ধর্ম হওয়ার কারণে জার্মানীতে ইসলামের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। জার্মানদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ লুক্কায়িত আছে। (তারিখে আহমদীয়াত ১০ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

১৯৬৭ সালে বিখ্যাত প্রাচ্যবিশারদ ডা. ইটালিও স্কুসি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাঁর নাম রাখেন মোহাম্মদ আব্দুল হাদী । তিনি এক বছরের মধ্যে স্পেরান্টো ভাষায় কুরআন মজীদের সম্পূর্ণ অনুবাদ সম্পন্ন করেন, যা কোপেনহেগেন থেকে প্রকাশিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৬৭ সালে জার্মানী সফর করেন। হুযূর (রাহে.) তার একটি সুসংবাদপূর্ণ স্বপ্নের বর্ণনায় বলেন, এক হিটলার হুযূর (রাহে.)-কে বলেন, আসুন আমি আপনাকে আমার যাদুঘর দেখাই। এই বলে সে ব্যক্তি হুযূর (রাহে.)-কে একটি কক্ষে নিয়ে যান, যেখানে বিভিন্ন মূল্যবান রত্ন ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় ছিল। সেই সব মূল্যবান পাথরের মধ্যে হৃদয়াকৃতির (অনেকটা পান পাতার মত) একটিতে, ***'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'*** খোদাই করা ছিল। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় হুযুর (রাহে.) বলেন, আমার ধারণা বাহ্যত যদিও জার্মান জাতিকে কঠোর মনে হয় এবং ধর্মের প্রতি অমনোযোগী দেখায় কিন্তু তাদের হৃদয় ইসলাম গ্রহণের উপযোগী।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৮৯ সনে আহমদীয়াতের শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন জলসার ধারাবাহিকতায় জার্মানীতে অনুষ্ঠিত জলসায় বলেন, বিগত একশ বছরের সাফল্যের কৃতজ্ঞতার প্রতীক স্বরূপ জার্মানীতে একশ' মসজিদ নির্মাণ করুন। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই জার্মানীতে ব্যাপকভাবে মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। *(তারিখে আহমদীয়াত, ৯ম খন্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা)*

স্পেন :

স্পেনে ইসলামের পুণ:প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর হৃদয়ে অন্তহীন ব্যকুলতা ছিল। তিনি (রা.) বলেন, "স্পেন থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে আমরা কি একে ভুলে যাব? কোন অবস্থাতেই আমরা একে ভুলতে পারি না। আমরা অবশ্যই পুনরায় স্পেন বিজয় করব।.....আমাদের তলোয়ার যেখানে পরাভুত হয়েছিল সেখানে এখন আমাদের যুক্তির ধার আর ঐশী সমর্থন বিজয়ী হবে। এবং ইসলামের সৌন্দর্য উপস্থাপন করে আমরা আমাদের স্পেনীয় ভাইদের একত্রিত করব।

১৯৩৬ সালে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মালেক মোহাম্মদ ফরীদ সাহেব গুজরাটিকে স্পেনে পাঠান। কিন্তু গৃহ যুদ্ধের কারণে তাঁকে স্পেন ত্যাগ করতে হয়। এরপর ১০ জুন ১৯৪৬ সালে মোহতরম মৌলভী করম এলাহী জাফর সাহেবকে মোবাল্লেগ হিসেবে স্পেন পাঠানো হয়।

২৫ মে ১৯৭০ তারিখটি স্পেনের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন। সেদিন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) স্পেনে আসেন। হুযূর (রাহে.) বিমান থেকে যখন মাদ্রিদ এয়ারপোর্ট দেখতে পান তখন হুযূর (রাহে.)-তাঁর সাথীদের বলেন, "আমি তো তারেক (রাহে.)-এর ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, তোমরা কি শুনতে পাও"? (আল ফযল, ৫ মে, ১৯৭১, ২য় পৃষ্ঠা)

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯ অক্টোবর ১৯৮০ সালে কর্ডোভা থেকে ৩২ কিলোমিটার দুরে পেদ্রোয়াবাদে ৭৪৪ বছর পর **মসজিদে বাশারত**-এর ভিত্তি প্রস্তর রাখেন। এই উপলক্ষ্যে হুযূর (রাহে.) বলেন, 'ইসলাম আমাদেরকে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে বসবাস করার শিক্ষা দেয়। আমাদেরকে বিনয় শেখায়।......আমাদের একমাত্র শিক্ষা হল ***Love for All hatred for none***- ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো 'পরে।

১৯৮২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) স্পেনের **মসজিদ বাশারত**-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

[তাহরীকে জাদীদের খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরনিকা অবলম্বনে]

মহত্তম জীবনের স্বরূপ

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ শহরে প্রিন্সেস স্ট্রীটের পাশে ওয়েভারলী ষ্টেশনের একশ’ গজ দূরে বৃহদায়তনের একটি স্মৃতিসৌধ রয়েছে। এই স্মৃতিসৌধটি বিগত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ স্কটিশ লেখক ও ইতিহাসবিদ স্যার ওয়াল্টার স্কটের প্রতি সম্মান ও তার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নির্মাণ করা হয়। এই স্মৃতিচিহ্নটি তার মৃত্যুকালের সেই কথাগুলি স্মরণ করায় যা তিনি মৃত্যু শয্যায় শুয়ে তার জামাতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “তোমার সাথে কথা বলার জন্য এক মিনিটের বেশি সময় আমার হাতে নেই। হে আমার প্রিয়, একজন ভাল মানুষ হও; সদগুণ সম্পন্ন হও, ধার্মিক হও–একজন সুন্দর মানুষ হও। যখন তুমি এখানে শয়ন করতে আসবে তখন অন্য আর কিছুই তোমাকে আরাম দেবে না”।

যদিও স্যার ওয়াল্টার স্কট সাহিত্যিক হিসেবে যথেষ্ট যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন, তিনিও তার জীবনের শেষ মুহূর্তে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে তার জীবনের সবচে’ দামী চিত্তবিনোদনের বিষয় ছিল সদগুণ অর্জন করা। পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ একটি মহান সত্য হচ্ছে : **“আমার ইবাদত করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করি নাই”।**

(সূরা নং ৫১, আয়াত নং ৫৭)

এই আয়াতে আল্লাহ্‌র ইবাদত বলতে গতানুগতিক নামায পড়াকে বুঝানো হয়নি। এর অর্থ হচ্ছে, আমরা আমাদের সকল চিন্তায়, কথায় এবং কাজে আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রকাশ করবো। আমাদের উচিত হবে আমাদের নৈতিক গুণাবলীর ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করা। এটাই হচ্ছে আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য এবং ফলত: আমাদের মনোযোগকে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে এই আদর্শের দিকেই কেন্দ্রীভূত করা উচিত। দিনের পর দিন আমরা আমাদের সকল চিন্তায়, কথায় অথবা লিখনীতে, কাজে এবং এমনকি প্রত্যেক মুখভঙ্গিতে যা আমরা সম্পাদন করি, এতে আমাদের ধার্মিকতার আলো ঝরানো উচিত।

ধার্মিক জীবন যাপনের একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে সরলতা এবং মহানবী (সা.) আমাদেরকে বিলাসী জীবন যাপনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে গেছেন এবং বলেছেন, বিলাসী জীবন যাপন করা থেকে সাবধান হও, কারণ আল্লাহ্‌র বান্দারা কখনো বিলাসী জীবন যাপন করে না।

নিম্নোক্ত দোয়া আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে :–

“হে আল্লাহ্ আমার হৃদয়ে এবং কর্ণে আলো ছড়িয়ে দাও, আমার চোখে এবং জিহ্বায় আলো ছড়িয়ে দাও; আলো ছড়িয়ে দাও আমার ডানে এবং বাঁয়ে; আমার ওপরে এবং নীচেও আলো ছড়িয়ে দাও। তোমার আলোয় আমাকে উদ্ভাসিত কর”।

অন্যত্র পবিত্র কুরআন ঘোষণা দেয়, আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সদগুণের ততখানি সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছা যেন তা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সম্মানজনক স্থানে উন্নীত করে, যা সর্বোপরি একজন সত্যিকার মু’মিনের চূড়ান্ত বাসনা হয়ে থাকে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, **“অবশ্যই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সে-ই সবচে’ বেশি সম্মানিত, যে সবচে’ বেশি তাক্‌ওয়াশীল”।**

(সূরা নং ৪৯, আয়াত নং-১৪)

কুরআন করীম স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করে, আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? কুরআন ঘোষণা করে যে, আমাদের উচিত নৈতিক গুণাবলীতে শ্রেষ্ঠতর হবার চেষ্টা করা। এমতাবস্থায় কেন আমরা অন্যান্য আকাঙ্খা পূরণকে অগ্রাধিকার দেবো? আমাদের বাস্তব সম্মত আকাঙ্ক্ষা থাকবে কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ আকাঙ্খা হোক নৈতিক গুণাবলীর উন্নয়ন। আল্লাহ্ ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি রমজান মাসের রোযা রাখা ফরয করেছেন শুধুমাত্র সদগুণ অর্জনের উপায় স্বরূপ। **“তোমাদের জন্য রোযাকে এ কারণে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা অধিকতর তাক্‌ওয়াশীল হতে পারো”।**

(সূরা নং ২ আয়াত নং ৮৪)

এই উক্তি মনে রেখে আমাদের উচিত, পূর্ব থেকেই ব্যগ্র প্রত্যাশা নিয়ে রমযানের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং রমযানের সকল রোযা পালন করা, যদি না বৈধ কোন কারণ এ কাজে আমাদেরকে বাধা প্রদান করে।

বিশ্বের অধিকাংশ লোক প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে। তারা ভুলে যায় যে, রৌপ্য যেমন স্বর্ণ অপেক্ষা কম মূল্যবান, তেমনি পুণ্য অপেক্ষা স্বর্ণ কম মূল্যবান। মানব স্বভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র

কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, **"নিশ্চয়ই মানুষ সম্পদের ভালবাসার জন্য ব্যগ্র"।**

(সূরা নং ১০০, আয়াত নং ৯)

যখন পর্যাপ্ত অর্থ থাকলে ভাল বোধ হবে, তখন এটাই বার বার খতিয়ে দেখে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, নৈতিক গুণাবলীর মত বস্তু, যা অর্থ দিয়ে ক্রয় করা যায় না, তা তো আমরা হারিয়ে ফেলিনি। প্রকৃত সমৃদ্ধির বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, **"অবশ্যই সেই ব্যক্তি উন্নতি লাভ করেছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে"।**

(সূরা নং ৮৭, আয়াত নং ১৫)।

দেহের জন্য যা সুস্থতা, আত্মার জন্য পুণ্যও তাই। মানুষ তাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে এবং সেজন্য খাদ্যের প্রতি সযত্ন-মনোযোগ দিতে তারা প্রস্তুত। যখন অসুস্থ হয় তখন দ্রুত ডাক্তার ডাকে এবং দ্রুত কার্যকর প্রতিকার চায়; কিন্তু সাধারণতঃ তারা তাদের আত্মাকে লালন পালনে, একে খাওয়ানোর বিষয়ে খুব কমই উদ্বিগ্ন থাকে এবং একইভাবে তাদের আধ্যাত্মিক অসুস্থতা সারানোর জন্য কার্যকর প্রতিকারের খোঁজ করে না।

সকল গুণাবলীর জন্য ইসলাম পূর্ণ-পথনির্দেশনা প্রদানকারী নিয়মাবলী সরবরাহ করে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করেন যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে, তাই আল্লাহ্‌র সাহায্য নিয়ে আমাদের মধ্যে উন্নততর গুণাবলীর উন্মেষ ঘটানো আমাদেরই কাজ।

ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চিন্তা ও আচরণ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা একটি নৈতিক গুণ। উদাহরণ স্বরূপ, ভালবাসা একটি নৈতিক গুণ, যখন তা সঠিকভাবে এবং সঠিক উপলক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়, অন্যথায়, যদি তা শুধুমাত্র প্রবৃত্তিতাড়িত অথবা ভুল লক্ষ্যে চালিত হয়, তখন এটি গুণ হিসেবে জাহির হয় না। পশুদের ভালবাসা এবং যত্ন যা তারা তাদের শাবকদের প্রতি প্রদর্শন করে তা প্রবৃত্তি-তাড়িত এবং সেজন্য তা পুণ্যের কাজ নয়। ভালবাসা কেবলমাত্র তখনই পুণ্যের কাজ বলে গণ্য হয় যখন তা সঠিক এবং বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতার মধ্যে প্রকাশ করা হয়। যে মা তার শিশুর প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা বর্ষণ করে এবং তার শিশু যা করতে চায় অথবা পেতে চায় তাই করতে দেয় বা প্রদান করে, তা 'নৈতিক গুণ ভালবাসা'-র উদাহরণ নয়; অথবা যে লোকটি অন্যের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণে তাকে নিয়ে পলায়ণ করে, তাও তার কোন 'নৈতিক গুণ ভালবাসা'-র উদাহরণ নয়। যথাযথ উপলক্ষ্যে সঠিক আচরণ অনুশীলন করাই হচ্ছে 'নৈতিক গুণ'।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) জামা'তের সদস্যদেরকে মিতব্যয়ী জীবন যাপন করতে এবং পোষাক ও গহনার অপব্যয় রোধ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, **"কুপ্রথার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করার জন্য আমি প্রত্যেক আহমদীর দরজায় কড়াঘাত করতে চাই। আমি তাদেরকে বলতে চাই যে, যারা অপচয়ী প্রথা ত্যাগ না করবে এবং নিজকে না শোধরাবে, তাদের জানা উচিত, আল্লাহ্‌র তাঁর প্রেরিত পুরুষের এবং আমাদের জামা'তের অমন লোকের কোন প্রয়োজন নেই; এবং পরিণামে তাকে এ জামা'তের বাইরে নিক্ষেপ করা হবে যেভাবে একটি মাছিকে দুধ থেকে উঠিয়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দেয়া হয়"।**

নৈতিক উন্নতির অবস্থা সমূহ :

মানুষের প্রতি আমাদের আচরণের বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নৈতিক উন্নতির তিনটি অবস্থার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। প্রথম অবস্থায় যা প্রয়োজন তা হলো আমাদের উচিত অন্যদের সাথে কমপক্ষে সেরূপ ব্যবহার করা যেরূপ ব্যবহার তারা আমাদের সাথে করে থাকে। ভালো আচরণের প্রতিদানে আমাদের উচিত ভালো আচরণ করা। দ্বিতীয় অবস্থায় প্রয়োজন হলো, যে আচরণ আমরা পেয়েছি, প্রতিদানে তদপেক্ষা অধিকতর ভালো আচরণ ও মঙ্গল পৌঁছানো এবং তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে কোন প্রতিদান পাবার চিন্তা না করেই সেবা দান করা ও মঙ্গল পৌঁছানো এমনকি ঐ লোককে এমন কোন কথা না বলা বা ইশারা না করা, যাতে সে বুঝতে পারে যে সে আমাদের নিকট কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছে। মনের এই অবস্থা এমন মাত্রায় অনুশীলন করা উচিত যাতে এটা এমন অভ্যাসের মত কাজ করে যেভাবে মা তার শিশুর প্রতি ভালবাসার আচরণ করে।

নৈতিক গুণাবলী ;

নৈতিক গুণাবলীতে বহুবিধ ব্যক্তিগত গুণের সমাহার ঘটে। তাদের মধ্যে আত্ম-সম্মান এবং অন্যদের প্রতি সম্মান, দয়া, সহানুভূতি, সাধুতা, ক্ষমা, সরলতা, পরিচ্ছন্নতা, ভদ্রতা. সাহসীকতা, চমৎকারিত্ব, মহত্ব, ধৈর্য, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, দানশীলতা, উদারতা, নম্রতা, আতিথেয়তা, দয়া, ন্যায় বিচার, আত্মসংযম, আত্মতৃপ্তি, প্রফুল্লতা,

সহানুভূতিশীলতা, কৃতজ্ঞতা, পবিত্রতা, সহনশীলতা, ভালবাসা নিস্বার্থপরতা এবং আরো অনেক গুণাবলী রয়েছে যা এ তালিকায় যুক্ত হতে পারে।

গুণের কোন দৃষ্টান্ত মুহাম্মদ (সা.) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নয়। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কর্তৃক রচিত কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো মুহাম্মদ (সা.) এর সুউচ্চ নৈতিকতার উচ্চ প্রশংসা করে :

"কত মহৎ মানুষ, কত সুন্দর মানুষ! তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস ফুলের ঘ্রাণ ছড়ায়। তাঁর মুখমন্ডলে আল্লাহ্ দৃষ্টিগোচর হন, তাঁর গুণও এমনই, তাঁর ঘটনাতো এরূপই। সেজন্য তিনিই প্রেমাস্পদ। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর গুণাবলীর চাহিদাই হচ্ছে তিনি এককভাবে প্রেমাস্পদ হবেন"।

অবাধ প্রবেশাধিকার দাতা, উদার অতি দানশীল, খোদাভীরুদের বন্ধু। এবং আভিজাত্য, মহত্ব, যশ ও আত্মার সৌন্দর্যে মুহাম্মদ (সা.) সৃষ্টিসমূহের সেরা। মহানুভবগণের আত্মা, নির্বাচিতগণের নির্বাচিত। তাঁরই মাঝে সকল মহৎ গুণাবলী তাদের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে। সকল যুগের আশীর্বাদ তাঁর (সা.) প্রাপ্য এবং একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই আমরা আল্লাহতে পৌঁছুতে পারি। তিনি (সা.) ধার্মিকদের, পবিত্রদের গৌরব। তিনি (সা.) পুণ্যবান ব্যক্তিদের গৌরব। তিনি (সা.) সবার অগ্রে, যারা তাঁর (সা.) পূর্বে সম্মানিত হয়েছেন। বস্তুত:পক্ষে শ্রেষ্ঠতা হলো পুণ্যে, সময়ের অগ্রে বা পশ্চাতে নয়"।

পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায় আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইসলামী সদগুণ সমূহ অনুশীলন করা এবং সে কারণে বেঁচে থাকার চাহিদাগুলোকে অবহেলা করা আমাদের পক্ষে বোকামী হবে, কারণ তাতে আমরা উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হবো। নৈতিক গুণাবলীর উন্নয়ন হচ্ছে সকল অর্জনের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং অতীব বড় পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য কাজ। অন্য আর কোন কাজের মধ্যে আমরা বৃহত্তর তুষ্টি ও সুখ দেখতে পাই না, এমন কি বৃহৎ অঙ্কের অর্থ সঞ্চয়ের মধ্যেও না।

ঐকান্তিক লক্ষ্য বস্তু

কোন বস্তু প্রাপ্তির জন্য প্রথম যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে ঐ বস্তুপ্রাপ্তির জন্য আমাদের মনে প্রবল আকাঙ্খা থাকতে হবে, অন্যথায় আমরা সম্ভবত: তা থেকে অনেক দুরে অবস্থান করবো। প্রবল আগ্রহ সকল ঘাটতি দূর করে। আমাদের লক্ষ্যবস্তু যা-ই হোক, প্রাপ্তির দিকে আমাদেরকে তা দ্রুত চালিত করে। অতএব এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

পবিত্র কুরআন কতক লোকের কথা উল্লেখ করে যারা ঘোষণা দিয়েছিল, **"আমরা আন্তরিকভাবে ইচ্ছা করি যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে ন্যায়পরায়ণ লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন"** *(সূরা নং ৫, আয়াত নং ৮৫)।* এসব লোকেরা আন্তরিকভাবে ন্যায়পরায়ণ হতে ইচ্ছা করেছিল। তারা এ ব্যাপারে অমনোযোগী ছিল না বা তারা শুধুই হালকাভাবে এ ইচ্ছা পোষণ করেনি। তারা আন্তরিকভাবে এ ইচ্ছা পোষণ করেছিল এবং ধার্মিক হবার জন্য তাদের প্রবল ইচ্ছা থাকার কারণে তারা কৃতকার্য হয়েছিল এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজী ও দয়ার প্রাপক হয়েছিল, যেভাবে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

সুতরাং তাদের দোয়ার কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে বাগানসমূহ দ্বারা পুরস্কৃত করেছিলেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। তার মধ্যে তারা বসবাস করবে; এগুলো ঐসব লোকদের পুরস্কার যারা সৎকাজ করে।

(সূরা নং ৫, আয়াত নং ৮৬)

আমরা যদি এই ধর্মযুদ্ধে প্রবেশ করি এবং আন্তরিকভাবে এবং প্রবল আকঙ্খা নিয়ে আমাদের ভিতরের নৈতিক গুণাবলীর উন্নতি ঘটাই, তাহলে আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ নিশ্চিত ভাবে ফল দিবে, মহিমান্বিত হবে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক পুরস্কৃত হবে।

নামায

মনোযোগ আকর্ষণের পরবর্তী বিষয় হচ্ছে নামায। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, সেই লোক অহংকারী, যে নিজের শক্তির ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে এবং আল্লাহ্র অসীম শক্তিকে উপলব্ধি করে না। তিনি (আ.) ঘোষণা দেন যে, তাঁর একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে নামায এবং তিনি (আ.) সবকিছুর জন্য আল্লাহর সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। এটা অপরিহার্য যে, নৈতিক গুণাবলী উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে নামাযের আশ্রয় গ্রহণ করে, স্বীয় প্রচেষ্টায় আল্লাহ্র সাহায্য চাইতে হবে। নামাযের আরেকটি বড় উপকারের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **"অবশ্যই নামায মানুষকে অশ্লীলতা ও প্রকাশ্য মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে"** *(সূরা নং ২৯, আয়াত নং ৪৬)।* পবিত্র কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে, আন্তরিক নামায নিজেই একটি সদগুণ : **"বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহকে স্মরণ করা হচ্ছে অতি মহান গুণ"** *(সূরা নং ২৯, আয়াত নং ৪৬)।* এসব অনুমতিপ্রাপ্ত সময়গুলোতে আমাদের দায়িত্ব সকল দিক থেকে যে বহুবিধ প্রলোভন আক্রমণ করে তা সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা। আল্লাহ্ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এর জবাব নামাযেই নিহিত আছে। শুধুমাত্র দৈনিক নিয়মিত নামাযে পাবন্দ হলেই চলবে না, শয়তানের প্ররোচনাসমূহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও নামায পড়তে হবে। মহানবী (সা.) প্রলোভনের সময়ে নামাযের

ফলপ্রসূতার কথা বলেছেন। তিনি (সা.) বলেন, *"ধার্মিকদের সম্বন্ধে কথা হলো, যখন শয়তানের তরফ থেকে কোন প্রস্তাব তাদেরকে আক্রমণ করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, এবং তারা সবকিছু সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ শুরু করে।"*

চিন্তা :

আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হলো, চিন্তা চেতনার সুব্যবস্থাপনা। কারণ সবকিছু চিন্তা থেকেই উৎপন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে বাইবেলের একটি উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরছি :-

"মানুষ নিজ অন্তরে যেমন চিন্তা করে, সে আসলে তেমনই" *(প্রবাদ ২৩ : ৭)।* বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, মানুষ হচ্ছে তা-ই যা সে চিন্তা করে এবং সে যা চিন্তা করে সেরূপই হয়ে ওঠে। সে হচ্ছে তার নিজ চিন্তার ফসল। আমাদের চরিত্র আমাদের চিন্তাসমূহের মূর্তপ্রতীক। আমাদের চিন্তার-ভিত্তির ওপরই আমরা আমাদের চরিত্র নির্মাণ করি। যা আমরা চিন্তা করি, তাতেই আমরা পরিণত হই। আমাদের নিজস্ব চিন্তাকে পরিচালনা করার শক্তির অধিকারী আমরা নিজেরাই এবং তদ্বারা আমরা আমাদের নিজস্ব পছন্দমত চরিত্র গঠন করতে পারি। কারণ আমাদের চরিত্র আমাদের চিন্তার প্রতিফলন অপেক্ষা বেশি কিছু নয়। অনৈতিক চিন্তার বীজ থেকেই একটি অনৈতিক চরিত্র গঠিত হয়; অপরপক্ষে নৈতিক চিন্তার বীজ থেকে নৈতিক চরিত্র জন্ম নেয়। মনোবিজ্ঞানের এই আইন তেমনই নিশ্চিতভাবে কাজ করে যেভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অথবা বিশ্বের অন্যান্য অটল আইন সমূহ কাজ করে। আমাদের নৈতিক গুণাবলীর উন্নয়নে আমাদের মন থেকে ভেজাল ও নেতিবাচক চিন্তাসমূহ পরিত্যাগ ও বাদ দিয়ে একে আমরা আমাদের নিজস্ব বিশাল সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। একটা জিনিষ আমরা অধিকার করি যা কোন সরকার আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না, তা হচ্ছে আমাদের নিজ চিন্তাসমূহ পছন্দ ও নিয়ন্ত্রণ করার স্বাধীনতা। ঠিক যেভাবে এক মালী তার বাগানকে আগাছা মুক্ত রাখে এবং শুধুমাত্র নিজ পছন্দে সেখানে ফুল ও ফল জন্মায়, সেভাবেই আমাদের মনের বাগান থেকে অনাকাঙ্খিত চিন্তা উপড়ে ফেলে শুধুমাত্র মহৎ, খাঁটি ও সৎ চিন্তা সমূহ রোপন করতে পারি যেগুলি জন্ম নিয়ে এবং প্রস্ফুটিত হয়ে আমাদের চরিত্রকে তাদের সুগন্ধ ও দীপ্তি দ্বারা সুশোভিত করবে।

**** মাত্র এক তরকারীর খাবার খাওয়া,***
**** সিনেমা থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করা,***
**** গৃহসজ্জা কমিয়ে ফেলা,***
**** পোষাকের খরচ কমিয়ে ফেলা,***
**** গহনা কমিয়ে ফেলা,***
**** অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য সামগ্রী ক্রয় না করা।***

আমরা আমাদের মনকে নাপাক চিন্তাসমূহের দিকে ঝুঁকাতে ইচ্ছা করলে সেগুলো অজ্ঞাতে মনের মধ্যে ছিঁচকে চোরের মত প্রবেশ করে। তাই ইসলাম সেগুলি ছুঁড়ে ফেলতে আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যাতে আমরা ঐসব বস্তু থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারি যেগুলি মন্দের জন্ম দেয়। একারণে আমাদের নিজেদেরকে নাট্যশালা, জুয়ার আড্ডা, মদের দোকান, পতিতালয় এবং নীচ প্রবৃত্তির চিত্তবিনোদন-স্থান থেকে দূরে রাখতে হবে। অন্যান্য পরিত্যাজ্য জিনিষ সমূহ হচ্ছে কামুক প্রকৃতির উপন্যাসের বই, যেগুলি দ্বারা বইয়ের দোকান প্লাবিত, এমন অধিকাংশ চলচ্চিত্রের ছবিসমূহ ও মহিলাদের নগ্ন ছবিতে পূর্ণ সাময়িক পত্রিকা সমূহ (ম্যাগাজিন), যেগুলিকে শয়তানের জঘন্য কাজ হিসেবে বর্ণনা করা যায়। এগুলি সবই শয়তানের কাজ যা অশুচি চিন্তা দ্বারা মনকে বোমাবিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা হয়। অধিকন্তু আমাদের উচিত অপরের ছিদ্রান্বেষী সকল চিন্তাসমূহ পরিত্যাগ করা, যেমন-ঘৃণা বিদ্বেষ, ঠকবাজী, অবজ্ঞা, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা ইত্যাদি, যেহেতু এগুলিও অনৈতিকতার পথ। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে শুধু মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতেই নির্দেশ দেয় না, উপরন্তু খোদাভীরু লোকদের সংস্পর্শে থাকতে নির্দেশ দেয়, যাদের কাছ থেকে আমরা নৈতিক উন্নতি আহরণ করতে পারি। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, কেবলমাত্র কর্মের জন্যই নয়, চিন্তার জন্যেও আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আমরা পাঠ করি, **"তোমার মনে যা আছে তা তুমি প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তোমার নিকট এর হিসাব চাইবেন"** *(সূরা নং ২, আয়াত নং ২৮৫)।*

মানুষ হিসেবে আমাদের পক্ষে এটি প্রায় অসম্ভব কাজ যে আমরা পূর্ণভাবে গুণাহ অথবা ভুল চিন্তা করা মন থেকে দূর করতে পারবো, এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে ঐগুলি পরিত্যাগ করতে অথবা দমন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তা করতে পারাই হচ্ছে পরহেজগারি। মহানবী (সা.) বলেছেন, *"যদি কোন মানুষ মন্দ চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হয় কিন্তু তা দমন করে অথবা মন থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং এর প্রভাবে কাজ না করে আল্লাহ্ তাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করবেন"।*

অধ্যবসায় :

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পুণ্যের পথে চলা কোন সহজ কাজ নয়, কারন এটা একটি পিচ্ছিল উর্ধ্বগামী ভ্রমণ। পিছলানোর সম্ভাবনা আমাদের সবারই রয়েছে। তদসত্ত্বেও এটি একটি উন্নতিমূলক এবং আনন্দদায়ক ভ্রমণ যা স্বর্গীয় মোহিনী শক্তিসম্পন্ন দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে চলে। বিনা প্রচেষ্টায় মূল্যবান কোন কিছুই লাভ করা যায় না এবং এই সাধারণ নীতি নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনিভাবে অন্যান্য বিষয়ে প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিনা কষ্টে কোন সুবিধা লাভ করা যায় না। যেহেতু নামায একটি অপরিহার্য ইবাদত, একই সাথে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে দৃঢ়তার সাথে অগ্রগামী হতে হবে এবং আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করতে হবে। কতক লোক ততখানি প্রাপ্তির জন্য দোয়া করে, যতখানি প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে তারা প্রস্তুত থাকে না এবং তখন তারা ভেবে বিস্মিত হয়, কেন তাদের দোয়ার উত্তর পাওয়া গেল না।

আমাদের সামনে লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে দিনে দিনে আমাদের নৈতিক গুণাবলীর উন্নয়ন সাধন করা। স্থবিরতা পছন্দনীয় হওয়া উচিত নয়। জানা কথা যে, আমরা যদি সামনে না এগোই তবে আমরা পিছিয়ে পড়ি। এই সৎ উদ্দেশ্য, যা এখন আমাদের সামনে বিদ্যমান তা নিজস্ব প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় দাবী করে। আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে, আমরা যখন মারা যাবো, আমরা যেন নৈতিক গুণের পথে আরোহণরত অবস্থায় মারা যাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ আমাদেরকে বলেন, **“ঐ সকল লোক, যারা তাদের প্রভুর অনুগ্রহ অন্বেষণে অধ্যবসায়ী হয়”**

(সূরা নং ১৩, আয়াত নং ২৩)।

পুণরায় আমরা পাঠ করি, **“আল্লাহ্ অবিচলদের সাথে আছেন”**

(সূরা নং ২, আয়াত নং-১৫৪)

যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে, প্রচেষ্টা ছাড়া নৈতিক গুণাবলীর উন্নয়ন সাধন করা যায় না, আমাদের প্রয়োজন অবিরতভাবে আত্মসতর্ক প্রহরা, আত্মবিশ্লেষণ, আত্ম নিয়মানুবর্তিতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করা। যেহেতু আমরা মানুষ এবং ফেরেশতা নই, আমাদের দুর্বলতা আছে এবং হোঁচট খেতে পারি এবং সময় সময় ভুলও করতে পারি কারণ আমাদের সামনে অনেক প্রলোভনের বস্তু আছে যাদেরকে যুদ্ধ করে পরাস্ত করতে হয়, কিন্তু যদি আমাদের আত্মা শক্তিশালী হয়, তাহলে চূড়ান্ত সাফল্যের বিষয়ে নিরাশ হবার প্রয়োজন নেই। আসলে নৈতিক উন্নয়নে অগ্রসর হবার জন্য আমাদের প্রতিটি প্রচেষ্টা আমাদেরকে উর্ধ্বে, বেহেশ্‌তের দিকে পরিচালিত করবে। এমনকি, যদি আমাদের উচ্চাভিলাষের মাত্রা অপ্রতুলও হয়, তথাপি বেহেশ্‌তমুখী পুণ্যের এক দীর্ঘপথ পরিক্রমণ করা হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, যদি আমরা হোঁচট খাই অথবা ভুল করি, তথাপি নিরাশ হবার কোন কারণ নেই।

“বলে দাও, হে আমার দাস, যে নিজ আত্মার প্রতি জুলুম করেছো, আল্লাহ্‌র দয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না, অবশ্যই আল্লাহ্ সকল গুনাহ মাফ করেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম মার্জনাকারী, অতীব দয়ালু”

(সূরা নং ৩৯ আয়াত নং ৫৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর রচিত ‘আহমদীয়াত বা খাঁটি ইসলাম’ গ্রন্থে লিখেন, “ইসলাম মানুষকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করে এবং তাকে বলে, ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও সে মনে এবং আচরণে পবিত্রতা অর্জন করতে সক্ষম, যা মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। এভাবে পবিত্রতা ও পুণ্যের দিকে তাকে স্থায়ী প্রচেষ্টা তৈরীতে ইসলাম সাহস যোগায় এবং চূড়ান্তভাবে তাকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম করে তুলে।”

মহারানী ভিক্টোরিয়ার যুগে জনৈক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন যা নিম্নরূপ : *“বহু সংখ্যক এবং বড় বড় ভুল না করে কেউ কখনো মহান অথবা ভাল মানুষ হয়নি।”*

যদিও আল্লাহ্‌র নবীগণ এই পর্যবেক্ষণ থেকে মুক্ত, কারণ তারা তাদের সারা জীবনই ব্যতিক্রমীভাবে ভাল, তথাপি এটা সত্য যে, অন্যান্য-সকল মহৎ লোকের জীবনেও ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং যদি সময় সময় এ পুণ্যের পথে আমাদের বিচ্যুতি ঘটে তাতে অসঙ্গতভাবে আমাদের দু:খিত হওয়া উচিত নয়; অপরপক্ষে উঠে দাঁড়ানো উচিত এবং পুনরায় একই ভুল না করে পূর্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত।

দু’হাজার বছর আগে **সেনেকা** নামীয় এক প্রসিদ্ধ রোমান গ্রন্থকার এক ধার্মিক লোক সম্বন্ধে নিম্নবর্ণিত গুণবিচার লিপিবদ্ধ করে গেছেন, **“সে-ই সর্বাপেক্ষা মহান লোক, যিনি অতীব অজেয় সিদ্ধান্ত নিয়ে সত্যকে পছন্দ করেন, যিনি ভিতর ও বাইরের কঠিন প্রলোভন প্রতিহত করেন, যিনি সর্বোচ্চ ভারী দায়িত্ব সানন্দে বহন করেন, যিনি ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও শান্ত থাকেন এবং যিনি ভয়াবহ বিপদে এবং ভ্রূকুটির মধ্যে চরম নির্ভয়, সত্যের, পুণ্যের এবং স্রষ্টার ওপরই যার ভরসা, সে-ই সবচে’ দ্বিধাহীন”**।

সরলতা

ধার্মিক জীবন যাপনের একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে সরলতা এবং মহানবী (সা.) আমাদেরকে বিলাসী জীবন যাপনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে গেছেন এবং বলেছেন, বিলাসী জীবন যাপন করা থেকে সাবধান হও, কারণ আল্লাহ্‌র বান্দারা কখনো বিলাসী জীবন যাপন

করে না।

আল্লাহ্‌র পথে সাদাসিধা জীবন যাপন আত্মাকে পরিস্কার ও উজ্জল করে কারণ এতে মানুষ এ জগতের বস্তুগত সাজ-সজ্জা থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে পড়ে। সাদাসিধা মানুষ কোন জিনিসের জন্য লালায়িত হয় না, অপরপক্ষে যারা বিলাসী জীবন যাপন করতে পছন্দ করে তাদের মনে তৃপ্তি থাকে না, যতক্ষণ না তারা যা উত্তম, তা লাভ করে। সত্যই বলা হয়েছে যে, তারাই সবচে' ধনী, যাদের অভাব অতি সামান্য। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, এ দুনিয়ার বিলাস সামগ্রী নয় বরং খোদাভীরুতাই হচ্ছে সর্বোত্তম সঞ্চয়। একজন ধার্মিক লোক অল্পেই তুষ্ট থাকে এবং বিলাসী জীবনের প্রতি আসক্ত হয় না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সম্পদ হচ্ছে আশীর্বাদ এবং ইহা আবশ্যিকভাবে মানুষকে সাদাসিধা জীবন যাপনে বাধা দেয় না যদিও মানুষ এর দ্বারা প্রায়শ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সর্বদা সাদাসিধা জীবন যাপন করা আল্লাহ্‌র নবীগণের পদ্ধতি ছিল। মহানবী (সা.) চাইলে সকল ধরনের বিলাস সামগ্রীর অধিকারী হতে পারতেন কিন্তু তিনি কঠোর আত্মসংযমী জীবন যাপন করা পছন্দ করেছেন। তাঁর (সা.) অভ্যাস ছিল সাদামাটা। তাঁর (সা.) খাদ্য ছিল সাধারণ। তাঁর (সা.) পোষাক ছিল সাধারণ। তাঁর (সা.) ঘর এবং তাঁর সাজসজ্জাও ছিল সাধারণ। তিনি (সা.) শক্ত তোশকে শুতেন এবং মোটা মাদুরের ওপর হেলান দিতেন যা তাঁর (সা.) গায়ের চামড়ায় দাগ ফেলতো। অন্যান্য দেশের শাসকরা যেখানে নরম তোশক ও গদি ব্যবহার করে তখন তিনি (সা.) কেন এমন মোটা মাদুরের ওপর বিশ্রাম নেন, সে বিষয়ে কেউ একবার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি (সা.) জবাব দেন যে, এটা উদ্বিগ্ন হবার বিষয় নয় কারণ তারা পছন্দ করেছে এ দুনিয়াকে আর তিনি (সা.) পছন্দ করেছেন আখেরাতকে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১৯৩৪ সনে **'তাহরীকে জাদীদ'** নামে এক কর্ম পরিকল্পনা চালু করেন। বিদেশে মিশন কায়েম ও পরিচালনার জন্য তিনি আহমদীয়া জামা'তের সদস্যগণকে এই স্কীমে বার্ষিক চাঁদা প্রদানের আহ্বান জানান। এই চাঁদা নিয়মিত সাধারণ চাঁদা, যা মাসিক আয়ের কমপক্ষে ষোল ভাগের এক ভাগ–এর অতিরিক্ত ছিল। তিনি আহমদীগণকে সরল জীবন যাপনের উপদেশও দেন। তাঁর (রা.) কতিপয় নির্দেশ ছিল নিম্নরূপ :

***** *মাত্র এক তরকারীর খাবার খাওয়া,*

***** *সিনেমা থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করা,*

***** *গৃহসজ্জা কমিয়ে ফেলা,*

***** *পোষাকের খরচ কমিয়ে ফেলা,*

***** *গহনা কমিয়ে ফেলা,*

***** *অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য সামগ্রী ক্রয় না করা।*

আমাদের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)ও জামা'তের সদস্যদেরকে মিতব্যয়ী জীবন যাপন করতে এবং পোষাক ও গহনার অপব্যয় রোধ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, **"কুপ্রথার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করার জন্য আমি প্রত্যেক আহমদীর দরজায় কড়াঘাত করতে চাই। আমি তাদেরকে বলতে চাই যে, যারা অপচয়ী প্রথা ত্যাগ না করবে এবং নিজকে না শোধরাবে, তাদের জানা উচিত, আল্লাহ্‌র, তাঁর প্রেরিত পুরুষের এবং আমাদের জামা'তের অমন লোকের কোন প্রয়োজন নেই; এবং পরিণামে তাকে এ জামা'তের বাইরে নিক্ষেপ করা হবে যেভাবে একটি মাছিকে দুধ থেকে উঠিয়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দেয়া হয়"।**

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) সাদাসিধা জীবন যাপনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেছেন, **"অপব্যয়ী হয়ো না। হে ঐ সকল লোক! যারা আড়ম্বর এবং দুনিয়ার আনন্দ ভালবাস, ভাল ভাবে স্মরণ রেখো, মানুষের জন্য এটা স্থায়ী আবাসস্থল নয়। বিলাসী জীবন যাপন এবং বস্তুগত জীবনের উপভোগের ভাল জিনিষের স্থায়ীত্বের কোন নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ্‌র খাতিরে বিলাসীতা ও আরামে জীবন যাপনের পথ পরিহার কর। এটা আসলে অভিশপ্ত পথ; এ অভিশাপ থেকে বাঁচার উপায় নেই। অন্যথায় তোমার আল্লাহ-দর্শনের সব মনোবাসনা পরিত্যাগ কর"**।

সাদাসিধা জীবন যাপনের আরেকটি সুবিধা হচ্ছে, এটা মানুষকে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের অধিকতর নিকটে আনে। উচ্চমানের জীবন যাপনে অভ্যস্ত লোকেরা গরীবদেরকে নীচ দৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের সাথে মিশতে চায় না কিন্তু সাদাসিধা জীবন যাপনে অভ্যস্তরা তাদের ধনাঢ্য বন্ধুদের সাথে মেলামেশার চাইতে হয় একা থাকতে অথবা সমবিশ্বাসী গরীবদের সাথে মিশতেই তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

নৈতিক গুণাবলীর উন্নয়ন একটি ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয় এবং এটা এমন নয় যে, শুধু শোনা এবং মনে রাখার বিষয়। এটা অনুশীলন করার বিষয়। নিশ্চিতভাবে এটা খুবই ব্যাপক বিষয় যার ওপর কয়েক খন্ড বই লেখা যেতে পারে। এই ব্যাপক বিষয়ের কয়েকটি মাত্র দিক সংক্ষেপে এখানে আলোচিত হলো। উদ্দেশ্য ছিল আমাদের মধ্যে নৈতিক গুণাবলীর উন্নয়নে অধিকতর মনোযোগ দানে কৌতুহল জাগানো এবং প্রেরণা বৃদ্ধি করা। আমাদের দোয়া হচ্ছে, যে বীজ আমরা ছড়ালাম, তা উর্বর মাটিতে পতিত হোক এবং সদগুণ সম্পন্ন ফলের গাছ উৎপন্ন করুক–আমীন!

[আহমদীয়া মিশনারী প্রয়াত মি. বশীর আহমদ অর্চার্ড প্রণীত পুস্তক 'Life Supreme' অবলম্বনে]

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহে কর্মতৎপরতার সংবাদ

পাক্ষিক আহমদীর ঈদপুণর্মিলনী অনুষ্ঠিত

গত ৯ অক্টোবর ০৯ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা দারুত তবলীগ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী কক্ষে ইশায়াত বিভাগ আয়োজিত পাক্ষিক আহমদীর ঈদপুণর্মিলনী অনুষ্ঠান সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। পাক্ষিক আহমদীর ইতিহাস সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল। বর্তমান যুগে প্রকাশনার গুরুত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করেন আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ বাংলাদেশ। এই অনুষ্ঠানে পাক্ষিক আহমদী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন পর্যায়ক্রমে আমীর–আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা, আমীর-আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ, আমীর-আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মীরপুর, প্রেসিডেন্ট-আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও এবং জনাব ফজল-ই-ইলাহী, ইন্টারনাল অডিটর প্রমুখগণ। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন, পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদক, জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মোহাতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন।

খুলনা-সাতক্ষীরা জেলা মজলিস আনসারুল্লাহর ৯ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৯ ও ১০ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনায় খুলনা-সাতক্ষীরা জেলা আনসারুল্লাহ্‌র ৯ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ এর মোহতরম সদর এর প্রতিনিধি ও রিজিওনাল নাযেম জনাব মুহাম্মদ আব্দুল গফুর সাহেবের সভাপতিত্বে বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খুলনা জামা'তের আমীর ও মোয়াল্লেম মৌ. শাহ আলাম খান সাহেব উপস্থিত থেকে ইজতেমার গুরুত্ব এবং আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব কর্তব্যের ওপর বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান ও নায়েব নাযেম উমুমী, খুলনা সাতক্ষীরা জেলা মজলিস জনাব এস, এম, মঞ্জুরুল আলম। দুই দিন ব্যাপী ৯ম বার্ষিক জেলা ইজতেমায় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায, দরসে কুরআনসহ তেলাওয়াত কুরআন, নযম, দ্বীনি মালুমাত,-লিখিত পরীক্ষা, বক্তৃতা, পয়গামের রেসানী, স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা ও প্রশ্নোত্তর (কুইজ) প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন খেলাধূলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মোয়াল্লেম মৌ. শাহ আলাম খান এবং জেলা নাযেম ও আমীর সাহেব।

১০ অক্টোবর, সকাল ৯-৩০ মিনিট হতে ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১২-৩০ মিনিটে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয় এতে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন জেলা নাযেম ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক ও মোয়াল্লেম মৌ. শাহ আলম খান। অত:পর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান ও নায়েব নাযেম উমুমী, খুলনা-সাতক্ষীরা জেলা মজলিস জনাব এস, এম, মঞ্জুরুল আলম সাহেব। সভাপতি সাহেব আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌দের দিকনির্দেশনা উল্লেখপূর্বক অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। দুই দিন ব্যাপী এই ৯ম বার্ষিক জেলা ইজতেমায় খুলনা-সাতক্ষীরা জেলার ৩টি মজলিসের মধ্যে ২টি মজলিস হতে ৩২ জন আনসারসহ প্রায় ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বৃহত্তর দিনাজপুর ৩য় জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বৃহত্তর দিনাজপুর এর ৩য় জেলা ইজতেমা/০৯ ইং গত ১৪ ও ১৫ আগষ্ট /০৯ ইং তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আহমদনগর, আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪/০৮/০৯ ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ৩:৩০ মি: কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব শহীদুল ইসলাম (বাবুল) নায়েব সদর মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন কেন্দ্রীয় বিশেষ প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ সারওয়ার মোর্শেদ, কায়েদ তাজনীদ ও ভারপ্রাপ্ত কায়েদ উমুমী মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ, মাওলানা বশিরুর রহমান সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্। আহমদনগর ও শালশিড়ির স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এবং উভয় মজলিসের স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেবগণ এবং খাকসার।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের শুরুতে ১ম স্থান অধিকারী জনাব সহিদ আহমদ সাহেব কুরআন তেলাওয়াত করেন। সভাপতি সাহেবের নির্দেশক্রমে উপস্থিত ভাতগাঁও,

ডোহান্ডা, শালশিড়ি ও আহমদনগর যয়ীমে আলা/যয়ীম সাহেবগণের পক্ষ থেকে মজলিসের কর্মকান্ডের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন এবং এতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মহোদয়গণের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন। পরিশেষে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ সারওয়ার মোর্শেদ সাংগঠনিক বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। সর্বশেষে সভাপতি সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ নসিহতমূলক বক্তব্য উপস্থাপনের পর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী শেষে আহাদনামা ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি হয়।

মাহমুদ আহমদ

ক্রোড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ২৪তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর '০৯ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার ২৪তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম ও সিলেট রিজিওনাল কায়েদ এস, এম ইব্রাহীম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান নাজির হোসেন ভূঞা। ক্রোড়া মজলিসের কায়েদ মারুফুর রহমান সান্টুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ক্রোড়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট গাজী মাজহারুল খোকন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কায়েদ, শেখ সাব্বির আহমদ, মৌ. মোজাম্মেল হক, শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন ইজতেমা কমিটির সেক্রেটারী এজাজ আহমদ ভূঞা। ইজতেমায় মোট ৫০ জন খোদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

আফজালুর রহমান রিপন

ফতুল্লার ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা ২০০৯ অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ফতুল্লার ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা ২০০৯ ইং ফতুল্লা নব নির্মিত মসজিদ নূরে এক দিনের অনুষ্ঠান অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সকাল ৮-৩০ মিনিটে স্থানীয় মসজিদের কায়েদ জনাব ফরিদ আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, পরীক্ষা, কুইজ ও বিভিন্ন খেলাধূলা প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। ২৫/০৯/০৯ ইং বাদ জুমুআ উক্ত ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ জনাব ফরিদ আহমদ, প্রধান অতিথি মোহতরম সদর সাহেবের সম্মানিত প্রতিনিধি ডা: শরিফুল হাকীম আহমদ সাহেব, বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহতরম মুহাম্মদ কামাল পাশা সাহেব। উক্ত ইজতেমায় ২৮ জন খোদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

ডাঃ বশির আহমদ

নাখালপাড়ায় ধর্মীয় আলোচনা সভা ও ইফতার

গত ১১/০৭/০৯ রোজ শনিবার নাখালপাড়া মসজিদে ধর্মীয় আলোচনা সভা ও ইফতারের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ, মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, মিশনারী ইনচার্জ এবং ঢাকা জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব বশির আহমদ সাহেব। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০ জন জেরে তবলীগ, ৬০ জন আহমদী উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই একত্রে ইফতার করেন।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে মিষ্টিমুখ ও ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়

ঈদুল ফিতরের নামাযের পর নাখালপাড়া হালকা মসজিদে সকল মুসল্লীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয় এবং সকলের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। এছাড়া আতফাল ও নাসেরাতদের মাঝে ক্যান্ডি, বেলুন, চিপস এবং জুস বিতরণ করা হয়।

বিশেষ দোয়ার আবেদন

আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফাজিলপুরের একজন সদস্য। আমি বর্তমানে চাকুরীর ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে কালাতিপাত করছি। তাই জামা'তের সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি। খোদা তাআলা যেন আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তিদান করেন সেই সাথে আমার পরিবারকেও যেন সবদিক থেকে হেফাযতে রাখেন।

দোয়াপ্রার্থী

মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ্

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, গত ১৫/০৯/০৯ইং মোতাবেক ২৪ রমযান ইফতারের সময় (৭:০২ সন্ধ্যা) সরাইল জামা'তের প্রবীণ সদস্যা সৈয়দ মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের পুত্র মাওলানা সৈয়দ সাঈদ সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যা সৈয়দা রশিদা আক্তার ৭৫ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে তাদের নিজ বাড়ী সরাইল মীর বাড়ীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুমার স্বামী মীর ফযলে আলী বেশ কয়েক বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। তিনি নি:সন্তান ছিলেন তাই তার অসুস্থ অবস্থায় দেখা শুনা করতেন ভাতিজা সম্পর্কে আত্মীয়গণ। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার, মুত্তাকী, নামাযী, কুরআন শরীফ পাঠকারী ও তসবীহকারিণী লাজনা ছিলেন। তার মৃত্যুতে আত্মীয় ও শুভাকাঙ্খীগণ মর্মাহত। আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন তার জন্য এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়ার আবেদন রইল।

এনামুল হক রনী

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, গত ১০/১০/০৯ইং তারিখ দিবাগত রাত ২:২৫ মি: এর সময় আমার মাতা কহিনুর বেগম (হালিমা বেগম) স্বামী কবির মোহাম্মদ

ইয়াকুব আলী দূর্গারামপুর জামা'ত, জেলা বি. বাড়ীয়া লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ছিলেন অত্র জামা'তের তৃতীয় আহমদী। মরহুমা আমার আম্মা আমার আব্বাকে সাথে করে এই দীর্ঘ জীবনে জামা'তের হিতার্থে স্মরণীয় খেদমত করে গিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাআলা তার এই খেদমতকে কবুল করুন। আম্মা তাঁর মৃত্যুকালে ৪ ছেলে ও ৫ মেয়ে, নাতি নাতনী ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে গ্রহণ করুন। জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং তার রেখে যাওয়া বংশধরদেরকে পূর্ণ সবর ধারণ করার তৌফিক দান করুন এবং তাদেরকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক প্রভুত কল্যাণে সিক্ত করুন এজন্য জামা'তের সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীদের কাছে একান্ত দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
মরহুমার ২য় ছেলে
মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

শুভ বিবাহ

* গত ২৯.০৫.০৯ মোছাঃ কাশপিয়া খানম জ্যোতি, পিতা-বাবুল আহমেদ, শিমরাইল কান্দি, বি, বাড়িয়া এর সাথে আসাফ উদ্দৌলা রাজু, পিতা-মোহাম্মদ আবুল হাসেম (বীর প্রতীক) সস্তাপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ এর বিবাহ ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং– ৭৯৩/০৯

* গত ৩১.০৭.০৯ মোছাঃ নঈমা আক্তার, পিতা-গোলাম মোস্তফা, ১১০/১ বাসাইল নরসিংদী এর সাথে সৈয়দ আশরাফ আহমদ, পিতা-মরহুম আব্দুল কাহহার, ১৩৪ সাংবাদিক আ/এ সেকশন মিরপুর, ঢাকা এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং–৭৯৪/০৯

* গত ১৯.০৬.০৯ মোছাঃ ইয়াসমিন আক্তার, পিতা-জনাব মুকুল মিয়া এর সাথে পূর্ব আহমদনগর, পোঃ ধাক্কামারা থানা+জেলা পঞ্চগড়, জনাব আনোয়ার হোসেন, পিতা-মরহুম মৌলভী আব্দুল নূর মোল্লা, মহারাজপুর গজেন্দ্র চাপিলা, পোঃ পুরুলিয়া, নাটোর এর বিবাহ ৮০,০০১/- (আশি হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং–৭৯৫/০৯

* গত ১৪.০৮.০৯ মোছাঃ সাবেরা আহমেদ (মলি), পিতা-তাহের আহমেদ (মুন্না), ৩৬৭/সি খিলগাঁও ঢাকা-১২১৯ এর সাথে মোহাম্মদ কুদরত উল্লাহ্ (রাহেন), পিতা-মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ ৭৯/৫ উত্তর যাত্রাবাড়ী এর বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুই লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং–৭৯৬/০৯

* গত ০৩.০৪.০৯ মোছাঃ সাবাতুন নূর, পিতা-মাহমুদ আহমদ, পূর্ব ইসলামবাগ, পঞ্চগড় এর সাথে ফিরোজ আহমেদ, পিতা-মৃত শামসুল মাষ্টার হক, শিবপুর, শামপুর, বদরগগঞ্জ, রংপুর এর বিবাহ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং–৭৯৭/০৯

* গত ০৩.০৭.০৯ মোছাঃ লাইলুন্নাহার আশা, পিতা-মোহাম্মদ আবু তাহের দুলাল, মজলিসপুর পোঃ দানপাড়া, জেলা কিশোরগঞ্জ এর সাথে মোহাম্মদ রমজান আলী, পিতা-মোহাম্মদ আলী, বেতাল কিশোরগঞ্জ এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং–৭৯৮/০৯

* গত ১২.০৭.০৯ মিস জোৎস্না পারভীন সুমা, পিতা-মোহাম্মদ মোহর আলী গাইন, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা এর সাথে মোহাম্মদ তাহের খালিদ রুমী, গ্রাম+ডাকঘর উথলী, জীবননগর, জেলা, চুয়াডাঙ্গা এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং–৭৯৯/০৯

* গত ২১.০৮.০৯ মোছাঃ ইশিতা আক্তার টগর, পিতা-সেলিম মস্তান, পশ্চিম দেওভোগ, পুর্বনগর, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম সোহেল, পিতা-মোহাম্মদ বজলুর রহমান ৬বি/৩-১ মিরপুর এর বিবাহ ২,২৫,০০০/- (দুইলক্ষ পচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং–৮০০/০৯

শিক্ষার্থীগণ পরীক্ষার পূর্বেও আবার ফলাফল বের হবার পরেও যুগ-খলীফার আশিস লাভ করতে হুযূর (আই.)-কে পত্র লিখুন–

ঠিকানা :

HADHRAT MIRZA MASROOR AHMAD (AI.)

16. GRESSEN HALL ROAD, SW18 5QL

LONDON. UK

দোয়ার আবেদন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একনিষ্ঠ সেবক, প্রবীণ আহমদী, জামা'তের বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তকাদির অনুবাদক ও লেখক এবং পাক্ষিক আহমদী'র সাবেক নির্বাহী সম্পাদক আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব দীর্ঘদিন থেকে লিভার জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ আছেন। তার সুস্থ্যতা ও দীর্ঘায়ুর জন্য পাক্ষিক আহমদীর পক্ষ থেকে সকলের কাছে বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

–সম্পাদক

শীতকালীন টমেটো চাষ পদ্ধতি

টমেটো বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় সবজি। টমেটো উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ুর ফসল। টমেটো ২০°–২৫° সে: তাপমাত্রায় ভাল জন্মে। প্রলম্বিত ঠান্ডা এবং মেঘলা আবহাওয়া, অত্যাধিক বৃষ্টিতে গাছের পরাগায়ন ব্যহত হয়। আবার ৩২ সে: এর উচ্চ তাপমাত্রায় গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। রাত্রিকালীন তাপমাত্রা ১৫° সে: এর বেশি হলে অনেক জাত ফল ধারণ করতে পারে না। সবদিক বিবেচনা করে শীতকালই হলো আমাদের দেশে টমেটো চাষের উত্তম সময়। এটি শীত মৌসুমে বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মে। সব ধরনের মাটিতে টমেটো চাষ করা যায় ৃ তবে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত উর্বর পলি দো-আঁশ ও এটেল দো-আঁশ মাটি টমেটো চাষের জন্য উত্তম।

১। জাত নির্বাচন :

টমেটোর অনেক জাত আছে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় উপযোগী মারিক, রতন, মারগ্লোব, বারি টমেটো–৩,৫,৬, বিনা টমেটো–২,৩ জাতের টমেটো চাষ করা যায়।

জমি তৈরী

৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করে তৈরী করতে হয়। এরপর ১ মিটার চওড়া এবং ২০ সে: মি: উঁচু করে বেড তৈরী করতে হবে। সেচ প্রদানের সুবিধার জন্য দুই বেডের মাঝে ৩০ সে: মি: ৩০ সে: চওড়া ২ সে: মি: গভীর নালা করতে হবে।

৩) চারা রোপন :

চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে অথবা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে চারা রোপন করতে হবে।

প্রতিটি বেডে দুই সারি করে চারা লাগাতে হবে।

সারি থেকে সারির দুরত্ব ৬০ সে মি: এবং চারা থেকে চারার দুরত্ব ৪০ সেমি: হবে।

পরন্ত বেলায় চারা তুলুন।

চারা তোলার পূর্বে বীজ তলায় হালকা সেচ দিন। এতে চাড়ার শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ কম হবে।

পরন্ত বেলায় চারা রোপন করুন।

৪) চাষের সময় কাল :

আগাম মৌসুম : বীজ বপন : ১৫ আগষ্ট – ১৫ সেপ্টেম্বর (ভাদ্র মাস)।

চারা রোপন : ১৫ সেপ্টেম্বর – ১৫ অক্টোবর (আশ্বিন মাস)।

ভরা মৌসুম : বীজ বপন : ১৫ সেপ্টেম্বর – ১৫ অক্টোবর (আশ্বিন মাস)।

চারা রোপন : ১৫ অক্টোবর – ১৫ নভেম্বর (কার্তিক মাস)।

নাবী মৌসুম : বীজ বপন : ১৫ নভেম্বর – ১৫ ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ মাস)।

চারা রোপন : ১৬ ডিসেম্বর – ১৫ জানুয়ারী (পৌষ মাস)।

৫) সার প্রয়োগ :

ভাল ফলার জন্য টমেটো চাষে নিম্নবর্ণিত হারে এবং পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে।

শেষ চাষের পূর্বে ছিটিয়ে ভাল করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

* গোবর = ৪০ কেজি/শতাংশ

* টিএসপি = ৮০০ গ্রাম/শতাংশ

* এম ও পি = ৪০০ গ্রাম শাতাংশ

* উপরি প্রয়োগের ইউরিয়া এবং এমওপি সার গাছের গোড়া থেকে ১০-১৫ সেমি: দূর দিয়ে মাটিতে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

* ২য় ও ৩য় কিস্তি উপরি প্রয়োগের পূর্বে পার্শ্ব কুশি ছাটাই করতে হবে।

৬) পরিচর্যা:

(ক) সেচ নিষ্কাশন: চারা রোপনের ৩-৪ দিন পর হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতিবার উপরি প্রয়োগর পর জমিতে সেচ দিতে হবে।

(খ) মালচিং : প্রতিটি সেচের পর মাটির উপরি ভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

(গ) আগাছা দমন : টমেটো জমিকে প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

(ঘ) বিশেষ পরিচর্যা : প্রথম ফুলের গোছার ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া নিচের সব পার্শ্ব কুশি ছাটাই করতে হবে। গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠিকা দিতে হবে।

৭) ফসল তোলা :

ফলের নীচে ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই বাজারজাত করণের জন্য ফল সংগ্রহ করতে হবে। এতে ফল অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

৮) ফলন : প্রতি শতাংশে ফলন = ৩০ কেজি থেকে ৪০০ কেজি।

পোকার আক্রমণ ও দমন ব্যবস্থাপনা :

চাষী ভাই টমেটোর মূলত ২ টি পোকা বেশি ক্ষতি করে থাকে। (ক) জাব পোকা, (খ) ফল ছিদ্রকারী পোকা, এছাড়া সাদা মাছি পোকা ও পাতা সুরঙ্গকারী পোকা ও গাছের ক্ষতি করে থাকে।

(ক) জাব পোকা : টমেটো গাছের পাতা, কচি ডগা, ও কাণ্ড থেকে রস শুষে খায়। গাছে মোজাইক রোগ ছড়ায়।

দমন ব্যবস্থা : এ পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি রগোর ৪০ অথবা সাইফানন ৫৭ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

(খ) ফল ছিদ্রকারী পোকা : এ পোকা টমেটো ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে ফল কুড়ে কুড়ে খায়। ফল খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে

পড়ে। টমেটোর ওপর কালচে ছিদ্র অথবা নতুন ছিদ্র দেখলে বুঝতে হবে আক্রমণ শুরু হয়েছে।

দমন ব্যবস্থা :

এ পোকা দমনের সহজ উপায় হলো আক্রান্ত ফল বাছাই করে পোকা মেরে ফেলা।

আক্রমণের হার বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন ৪০ ইসি জাতীয় কীট নাশক প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি পরিমাণ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

(গ) সাদামাছি পোকা :

এ পোকা গাছের পাতার রস চুষে খায়। গাছের পাতার মধ্যে ছোট ছোট সাদা বা হলদে দাগ দেখা গেলে বুঝতে হবে সাদা মাছির আক্রমণ হয়েছে।

দমন ব্যবস্থা :

এ পোকা দমনে ম্যালেথিয়ন- ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি পরিমাণ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

আক্রমণের পরিমাণ বেশি হলে ফারটোপ অথবা কেয়ার ৫০ এসপি ২ গ্রাম করে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভিজিয়ে দিতে হবে।

(ঘ) পাতা সুরঙ্গকারী পোকা : এ পোকার ক্ষুদ্র কীড়া পাতা ছিদ্র করে পাতার দুই পর্দার মাঝের সবুজ অংশ আঁকা বাঁকা সুরঙ্গ করে খায়। পাতার রং ফ্যাকাশে হলে বুঝতে হবে এ পোকার আক্রমণ হয়েছে। দমন ব্যবস্থা : অনুমোদিত কীট নাশক স্প্রে করতে হবে।

রোগ বালাই ও দমন ব্যবস্থা :

(ক) টমেটো ঢলে পড়া রোগ : এ রোগটি লাল মাটিতে চাষ করলে বেশি হয়। গাছের যে কোন বয়সে এ রোগটি হতে পারে। আক্রান্ত গাছ ঢলে পড়ে পুরো গাছটি দ্রুত মরে যায় ও ফলন কম হয়।

দমন ব্যবস্থা ;

আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্রই তুলে ধ্বংস করতে হবে রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করতে হবে।

(খ) আগাম দসা রোগ : এ রোগের ফলে :

* বয়স্ক গাছের পাতায় প্রথমে বলয়ের মত গাঢ় বাদামী দাগ পড়ে।

* ফল আক্রান্ত হলে, ফলে ও পাতার বন্যায় কুচকানো বাদামি থেকে কালো রংয়ের বলায়াকৃতির দাগ সৃষ্টি হয়। ফল পাকার পূর্বেই ঝড়ে পড়ে।

দমন ব্যবস্থা :

যে জমিতে এ রোগ নিয়মিত এবং বেশি হয় সেখানে রোপন সময় পরিবর্তন করতে হবে। রোগ মুক্ত গাছ বা উৎস থেকে বীজ সংগ্রহ করা। শস্য পর্যায় অনুসরণ করা।

অনুমোদিত ছত্রাক নাশক যেমন রোভারাল ২ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছ ভিজিয়ে দিয়ে ১৫ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করতে হবে।

(গ) নাবী ধসা/মড়ক : এ রোগ হলে :

* টমেটো গাছের পাতাতে কালো দাগ দেখা যায়। মনে হয় পাতা পানিতে ভিজে আছে।

* আক্রান্ত পাতার নিচে সাদা রংগের চাতা পরতে দেখা যায়। আক্রান্ত পাতা এবং কাণ্ডে তুলার মতো ছত্রাক জালির আবরন দেখা যায়।

* আক্রান্ত জমি থেকে পোড়া পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়।

* শেষ অবস্থায় পাতা কাণ্ড শাখা সব পুড়ে যাবার মত মনে হয়।

দমন ব্যবস্থা :

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অথবা ঘন কুয়াশা ও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ৩-৪ দিনের বেশি চলতে থাকলে আর দেরি না করে ছত্রাকনাশক যেমন রিডেমিল গোলনড অথবা ম্যানকোজের ব্যবহার করতে হবে। ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১ম বার স্প্রে করার ৩ দিন পর ২য় বার স্প্রে করতে হবে।

আক্রান্ত জমির ফসল সম্পূর্ণ পুড়ে ধ্বংস করতে হবে

(ঘ) ড্যাম্পিং অফ :

এটা একটি ছত্রাক জনিত রোগ এ রোগের কারণে চারার গোরায় পানি ভেজা দাগ হয়ে পচে যায়। অনেক সময় শিকড় পচে চারা মারা যায়।

দমন ব্যবস্থা :

আক্রান্ত স্থলে রিডোমিল গোল্ড ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

(ঙ) টমেটোর শিকড়ে গিট রোগ :

এ রোগ দমনের জন্য প্রতি একরে ২ কেজি ৬০ জি ফুরফুরান/কেয়ার প্রয়োগ করতে হবে।

(চ) হলুদ পাতা কোঁকড়ানো : এ রোগ হলে :

* পাতা কিনার থেকে মধ্যশিরার দিকে গুটিয়ে যায়।

* পাতা খসখসে হয়ে শিরাগুলো হলুদ হয়ে কুঁকড়িয়ে যায়। পাতা পীতবর্ণ হয়ে যায়।

* আক্রান্ত গাছের ডগায় ছোট ছোট পাতা গুচ্ছ আকার ধারণ করে।

দমন ব্যবস্থা :

চারা লাগানোর এক সপ্তাহ পর থেকে ৭-১০ দিন পরপর অ্যাডমায়ার নামক বিষ প্রয়োগ করে সাদা মাছি পোকা দমন করতে হবে।

টমেটোর জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

রোগ মুক্ত চারা লাগাতে হবে।

ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত নাইলনের নেট দিয়ে বীজ তলা ডেকে চারা উৎপাদন করতে হবে।

ফল সংগ্রহের দুই সপ্তাহ পূর্বে স্প্রে বন্ধ করতে হবে।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরয়া'ত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে

সংকলন ও উপস্থাপনা : এম. আহমদ

জাল ভিসায় লিবিয়ায় গিয়ে ৪০ বাংলাদেশি আটক ॥

লিবিয়ার ত্রিপোলি বিমানবন্দরে ৪০ বাংলাদেশিকে আটক করেছে অভিবাসন পুলিশ। তাদের সবার ভিসা জাল। বাংলাদেশ থেকে জাল ভিসা বানিয়ে তাদের সেখানে পাঠানো হয়েছে। এমনকি লিবিয়ার কোন কোম্পানিতে কাজ করার অনুমতিপত্রও তাদের নেই। অভিবাসন পুলিশ শনিবার তাদের আটক করে গতকাল রোববারই আরেকটি ফ্লাইটে দুবাইয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেখানকার পুলিশ বাংলাদেশ দূতাবাসকে জানিয়ে দিয়েছে, এই শ্রমিকেরা দুবাই থেকে কিভাবে দেশে ফিরবেন, সেই দায়িত্ব তারা নিতে পারবে না। লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস বলছে, এ ধরনের প্রতারণার ঘটনায় দেশের ভাবমূর্তি যেমন সঙ্কটে পরবে, তেমনি শ্রমবাজারও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(প্রথম আলো, ১৯ অক্টোবর, ০৯)

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গুদামে আগুন, বই ছাপানোর বিপুল কাগজ পুড়ে গেছে ॥

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) গুদামে গতকাল রোববার ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সারাদিন চেষ্টা করেও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। আগুন লাগার কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে নাশকতার বিষয়টি উড়িয়ে দিচ্ছেন না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

আগুনে কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তা নিশ্চিত না হওয়া গেলেও, এর কারণে আগামী শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের হাতে সময় মতো বই তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার সমস্যায় পড়তে পারে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পরিদর্শক শ্যামল বাড়ৈ বলেন, গুদামে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বই ছাপানোর জন্য ৬৫ হাজার রিম কর্ণফুলী কাগজ ও ১০ হাজার রিম বসুন্ধরা কাগজ ছিল। এ ছাড়া নতুন বছরের প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ছাপা হওয়ার বেশ কিছু বই ছিল। তাঁরা ধারণা করছেন, ভেতরে আরো অন্যান্য কাগজপত্র সব পুড়ে গেছে।

(প্রথম আলো, ১৯ অক্টোবর, ০৯)

সমকাল

রোববার ২৬ আশ্বিন ১৪১৬ ১১ অক্টোবর ২০০৯

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিবাদ

দৈনিক সমকালে ৩ অক্টোবর 'ইসলাম এক-দল অনেক' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। সংগঠনের দফতর সম্পাদক স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্রে বলা হয়েছে, প্রতিবেদনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে অসত্য এবং আংশিক সত্য তথ্য উপস্থাপন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর মত একটি অসহিংসবাদী, অরাজনৈতিক ও আইন মান্যকারী ধর্মীয় সম্প্রদায়কে এভাবে উপস্থাপন দুঃখজনক। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নামকরণ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর নামের কারণে করা হয়নি। 'আহমদ' হলো আমাদের প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরতে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর আরেকটি নাম। যে নামের উল্লেখ সূরা সাফ-এর ৬ নম্বর আয়াতেও রয়েছে। সেই পবিত্র নাম 'আহমদ' অনুসারে আমাদের তরীকার নাম রাখা হয়েছে 'আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত'।

হিযবুত তাহরীর নিষিদ্ধ, আরও সাত জঙ্গী সংগঠন তালিকায় ॥

ধর্মভিত্তিক উগ্রপন্থী আন্তর্জাতিক সংগঠন হিযবুত তাহরীরের সব ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জারী করা এক আদেশে হিযবুত তাহরীরকে নিষিদ্ধ করা হয়। সরকারী দলের সাংসদ এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আইনজীবী ফজলে নূর তাপসের ওপর বোমা হামলার পরদিন সরকার এ সিদ্ধান্ত নিল।

জননিরাপত্তার সার্থে আরও সাতটি জঙ্গী সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে আগামী রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। এর আগে ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে দেশে ১২টি ধর্মভিত্তিক জঙ্গী সংগঠনের তৎপরতা নিয়ে আলোচনা হয়। সংগঠনগুলো হচ্ছে–হিযবুত তাহরীর, জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি), হিজবুত তাওহীদ, উলামা আঞ্জুমান আল বাইয়্যিনাত, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি (আইডিপি), ইসলামী সমাজ, তৌহিদ ট্রাষ্ট, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি), শাহাদাৎ-ই আল হিকমা, তাআমির উদ-দ্বীন বাংলাদেশ এবং আল্লাহ্‌র দল।

এগুলোর মধ্যে ৪টি সংগঠন-জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি), শাহাদাৎ-ই আল হিকমা ও জেএমজেবিকে বিগত বিএনপি জামায়াত জোট সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

(প্রথম আলো, ২৩ অক্টোবর, ০৯)

চুলের দাম ১৮ হাজার ডলার ॥

প্রয়াত রফ এ্যান্ড রোল কিং এলভিস প্রিসলির চুল আর শার্টের দাম কত জানেন? মাত্র ১৮ হাজার ৩শ ডলার। এ দরেই এগুলো বিক্রি হয়েছে। আর মনোগ্রামসহ ঘিয়ে রঙের এক শার্টের দাম ৬২ হাজার ডলার। তার অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর মধ্যে লাল রঙের শার্ট বিক্রি হয়েছে ৩৪ হাজার ডলারে।

(জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর, ০৯)